দুর্যোগের মুখোমুখি

সাংবাদিকের করণীয়

শাহরিয়ার খান

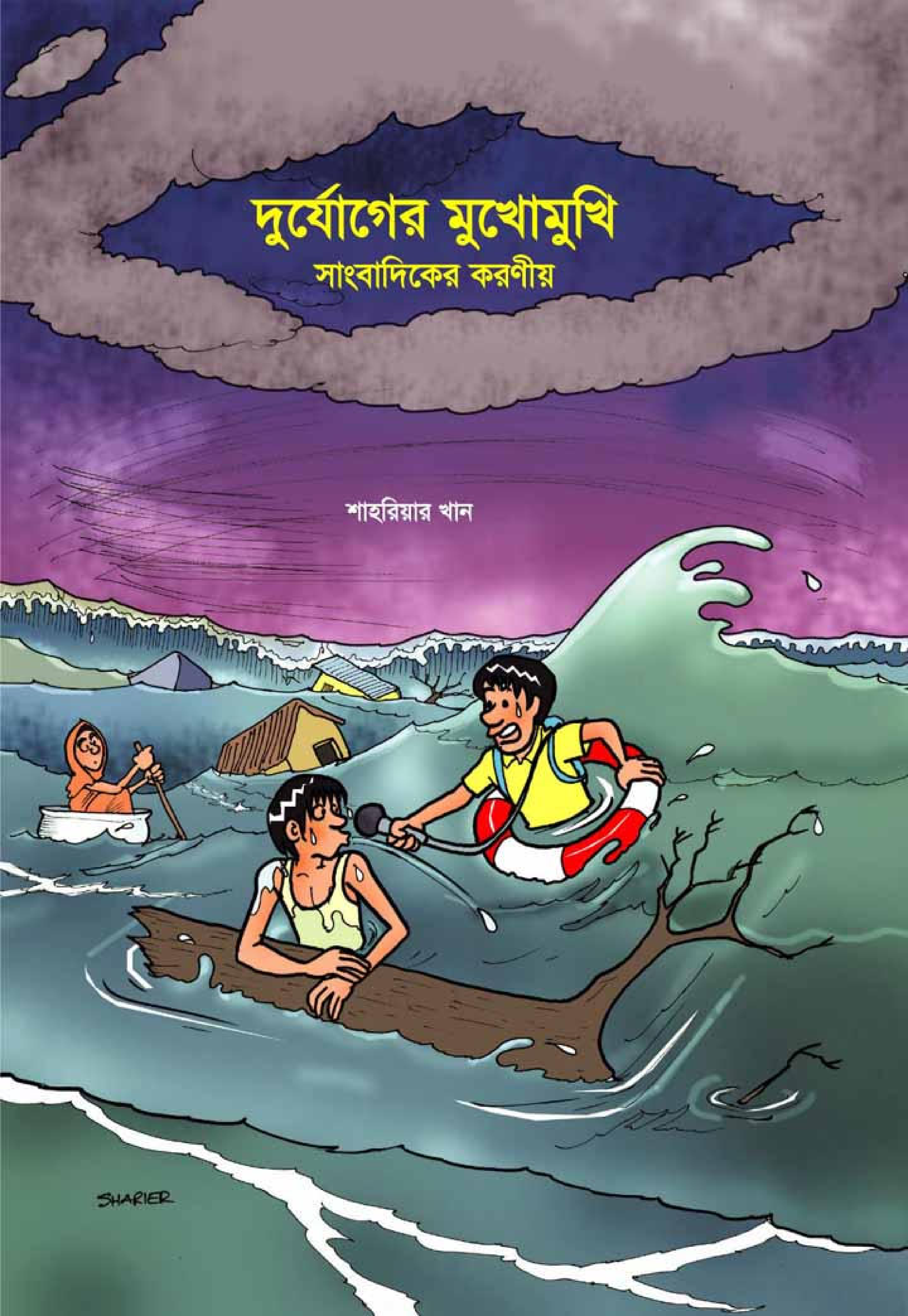

দুর্যোগের মুখোমুখি

সাংবাদিকের করণীয়

শাহরিয়ার খান

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

MRDI

© ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০১১

প্রচ্ছদ ও কার্টুন : শাহরিয়ার খান

অলংকরণ : জি এম কিরণ, মুদ্রণ : ট্রান্সপারেন্ট

ISBN : 978-984-33-4403-8

বাংলাদেশে মুদ্রিত

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ
২/৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭
ই-মেইল : info@mrdibd.org, ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

বিষয়সূচি

ভূমিকা		১
প্রথম অধ্যায় : দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা		৩
ক.	দুর্যোগের সংজ্ঞা	৫
খ.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৬
গ.	বিপদাপন্নতা	৮
ঘ.	স্থানীয় জনপদভিত্তিক দুর্যোগ মোকাবিলা	৮
ঙ.	এক নজরে বাংলাদেশের দুর্যোগসমূহ	৯
চ.	জাতীয় দুর্যোগ নীতি ও পরিকল্পনা	১১
ছ.	গুরুত্বপূর্ণ দুর্যোগ প্রতিরোধ প্রকল্প	১৩
জ.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত সংস্থাসমূহ	১৪
দ্বিতীয় অধ্যায় : দুর্যোগ ও সাংবাদিকতা		১৭
ক.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সংবাদমাধ্যম	১৯
খ.	দুর্যোগ-ঝুঁকিসংক্রান্ত যোগাযোগ ও সংবাদমাধ্যম	২০
গ.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা	২০
ঘ.	দুর্যোগ প্রতিরোধ কি লাভজনক	২৪
ঙ.	দুর্যোগ সাংবাদিকতার নৈতিকতা	২৫
তৃতীয় অধ্যায় : বন্যার পর রিপোর্টিং		২৭
ক.	বাংলাদেশে বন্যা	২৯
খ.	বন্যা নিয়ন্ত্রণে সরকার ও এনজিওদের ভূমিকা	৩০
গ.	বন্যার ওপর রিপোর্টিং : কী কী করবেন	৩২
ঘ.	বন্যার ওপর রিপোর্টিং : কিছু টিপস	৩৪
ঙ.	ঝুঁকি নিরসনমূলক বিশেষ রিপোর্টিং	৩৬
চতুর্থ অধ্যায় : সাইক্লোন এবং ঝড় রিপোর্টিং		৩৯
ক.	সাইক্লোন, ঝড় ও ঝুঁকিপূর্ণ জনপদ	৪১
খ.	সরকার ও এনজিওদের ভূমিকা	৪৫
গ.	সাইক্লোন ও ঝড়ের ওপর রিপোর্টিং	৪৬
ঘ.	ঝুঁকি নিরসনমূলক বিশেষ রিপোর্টিং	৪৯

পঞ্চম অধ্যায় : জলবায়ু পরিবর্তন ৫১

ক. জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ঝুঁকি ৫৩

খ. জলবায়ু পরিবর্তনে কী কী ঘটতে পারে ৫৪

গ. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সরকারের কৌশল ও পদক্ষেপ এবং বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা ৫৬

ঘ. জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর বিশেষ রিপোর্টিং ৫৮

ষষ্ঠ অধ্যায় : ভূমিকম্প ৬১

ক. বাংলাদেশের ভূমিকম্প-ঝুঁকি ৬৩

খ. ভূমিকম্প মোকাবিলার প্রস্তুতি ৬৬

গ. ভূমিকম্প-সংক্রান্ত রিপোর্টিং ৬৭

সপ্তম অধ্যায় : বাংলাদেশের অন্যান্য দুর্যোগ ৬৯

ক. লবণাক্ততা ৭১

খ. আর্সেনিক ৭২

গ. জলাবদ্ধতা ৭৬

ঘ. ভূমিধস ৭৮

ঙ. খরা ৮০

চ. নদীভাঙন ৮২

অষ্টম অধ্যায় : শব্দকোষ ৮৫

দুর্যোগ ও জলবায়ু-সম্পর্কিত ওয়েব ঠিকানা ১২৪

তথ্য সূত্রসমূহ ১২৭

ভূমিকা

প্রাকৃতিক দুর্যোগের খবর কতটুকু, কীভাবে সংবাদমাধ্যমে আসে বা এর গুণগত দিক কতটা প্রভাব রাখছে—তা নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয় না। আবার দুর্যোগ নিয়ে কতভাবে সংবাদমাধ্যমে রিপোর্ট হতে পারে—সে দিকটাও সচরাচর সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরা হয় না। দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়েই ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)-এর এই উদ্যোগ। এজন্য ২০০৯ সালে একটি জরিপের মাধ্যমে সাংবাদিকদের কাছ থেকেই দক্ষতা বৃদ্ধির চাহিদা নিরূপণ করা হয়। সাংবাদিক বা মাঠপর্যায়ের রিপোর্টারদের জন্য এই সহায়িকাটি প্রকাশিত হচ্ছে সেই চাহিদার প্রতিফলন হিসেবে।

বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি সার্বিক পরিবর্তন এসেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনায় দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং কমিউনিটির দুর্যোগ প্রস্তুতির বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। আমাদের দেশে সংবাদমাধ্যমে দুর্যোগ ঘটার সময় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আগাম পূর্বাভাস দেওয়ার প্রতিবেদন ছাড়া এর ঝুঁকি নিরসন এবং স্থানীয় কারণ, যা পরবর্তী পর্যায়ে দুর্যোগে রূপ নেয় সে বিষয়ে প্রতিবেদন কম হয়। সেই অর্থে বিশেষায়িত রিপোর্টিং হয় না। এই বইয়ে দুর্যোগের সার্বিক প্রেক্ষাপট এবং ঝুঁকি নিরসনের দিকটি রিপোর্টাররা কীভাবে তুলে ধরতে পারেন সে বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমে দুর্যোগ-বিষয়ক কাভারেজের ধরন পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে, বিশেষজ্ঞ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে এবং দুর্যোগ-বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এই বইটির একটি রূপরেখা ও বিষয়বস্তু ঠিক করা হয়েছে। এ কাজে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাদের সকলের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা। শব্দকোষ অধ্যায়ের শব্দ ও এর ব্যাখ্যাগুলো হুবহু উদ্ধৃত করা

হয়েছে, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি) কর্তৃক প্রকাশিত দুর্যোগকোষ গ্রন্থ থেকে। এজন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই বইটি লিখে এবং কার্টুন এঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন শাহরিয়ার খান, ডেপুটি এডিটর, দ্য ডেইলি স্টার। বইটির বিভিন্ন অংশ পুনর্নিরীক্ষণ করেছেন সার্ক মেটেরোলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানী সুজিত কুমার দেবশর্মা, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সেন্টারের উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. মমিনুল হক সরকার এবং বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মেহেদী আহমেদ আনসারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সেন্টার ফর গ্লোবাল চেঞ্জের নির্বাহী পরিচালক আহসান উদ্দিন আহমেদ, এমআরডিআই আয়োজিত সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ সেশনে যে তথ্যপত্র ব্যবহার করেছিলেন সেগুলোর কিছু তথ্য এই বইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া সার্বিক পরামর্শ দিয়েছেন ডেইলি স্টার-এর ডেপুটি এডিটর ইনাম আহমেদ এবং ভাষাগত দিকটি দেখেছেন দেশ টিভির যুগ্ম সম্পাদক সুকান্ত গুপ্ত অলক। তাদের প্রত্যেককে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই প্রকল্পে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা—ইউনেস্কো এবং প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত এমআরডিআই-এর সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রথম অধ্যায়

দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

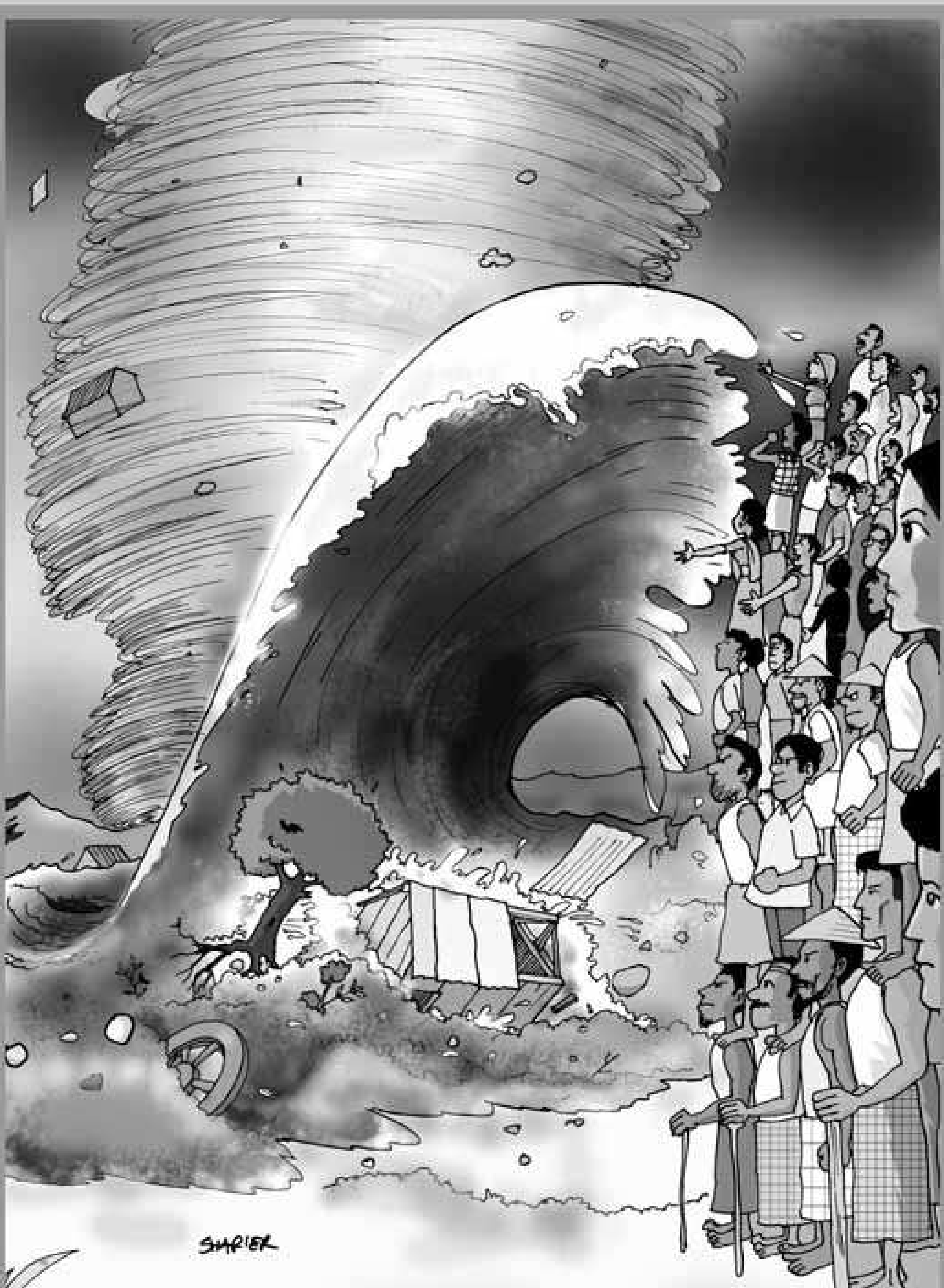

ক. দুর্যোগের সংজ্ঞা

অভিধানে দুর্যোগ বলতে বোঝায় হঠাৎ ঘটে যাওয়া বিপত্তি কিংবা আপদ, যার ফলে ব্যাপক সম্পদ ধ্বংস হতে পারে এবং দুর্গতি হতে পারে।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হ্যান্ডবুকে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে : দুর্যোগ হচ্ছে মানবসৃষ্ট কিংবা প্রাকৃতিক, হঠাৎ কিংবা ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত একটি ঘটনা, যা একটি জনপদকে বাধ্য করে বিশেষ প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ নিতে।

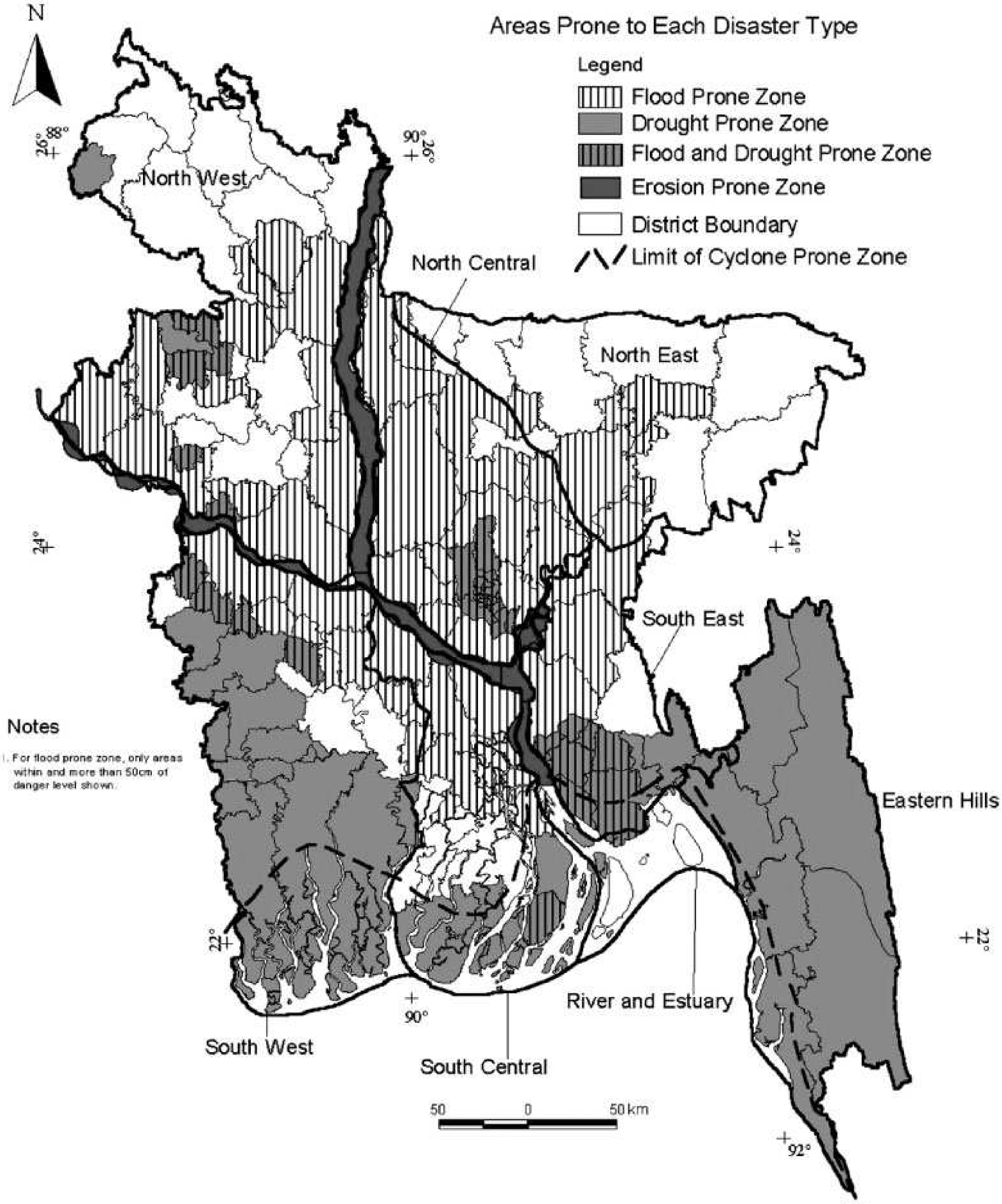

মানচিত্র-১ : দুর্যোগপ্রবন এলাকাসমূহ

পৃথিবীতে মানবসভ্যতা প্রাচীনকাল থেকে দুর্যোগকে মোকাবিলা করেই বিকশিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন জনপদে মানুষ তাদের নিজ এলাকার নিত্য দুর্যোগকে মাথায় রেখে তৈরি করেছে বাড়িঘর। তবে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সব সভ্যতাই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে সৃষ্ট তাণ্ডবকে তাদের নিয়তি হিসেবে মাথা পেতে গ্রহণ করেছে।

পরবর্তী সময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পদ ও জীবনের ক্ষয়ক্ষতিকে কমিয়ে আনার ধারণা বিকশিত হয়েছে। এখনো পর্যন্ত উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনুন্নত দেশে দুর্যোগে মৃত্যুর হার অনেক বেশি। দুর্যোগে মৃত্যুর ৯৫ ভাগ ঘটে থাকে অনুন্নত দেশগুলোয়। যদি উন্নত দেশে অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হয় জিডিপির ১ ভাগ, অনুন্নত দেশে তা জিডিপির ২০ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে।

দুর্যোগের উৎস চার ধরনের—

১. জলবায়ুসংক্রান্ত : বন্যা, বিভিন্ন ধরনের ঝড়, নদীভাঙন ও খরা

২. ভূপ্রাকৃতিক : ভূমিকম্প, ভূমিধস, অগ্নুৎপাত

৩. প্রযুক্তিগত : কেমিক্যাল বিপর্যয়, শিল্পদুর্যোগ, দূষণ ইত্যাদি

৪. মহামারী

দুর্যোগ কখন ঘটে

প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস বেশ জটিল কাজ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন—ভূমিকম্পের পূর্বাভাস অসম্ভব। বন্যা কিংবা সাইক্লোনের নির্ভুল পূর্বাভাস করার প্রযুক্তি বিদ্যমান। এ ছাড়া ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত, ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলবায়ু ও ভূগঠনের নির্দেশিকা বিবেচনা করে এটা বলা সম্ভব যে কোন কোন এলাকা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ।

খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

পৃথিবীতে ভূমিকম্প কিংবা ঝড়ঝঞ্ঝা সব সময়ই হয়ে এসেছে। কিন্তু মানবসভ্যতার বিকাশের ফলে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বিপর্যয়ের মাত্রা বেড়েছে। এ জন্যই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, যার মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা যতটুকু সম্ভব কমিয়ে আনা যায়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে একটি প্রায়োগিক বিজ্ঞান, যার মাধ্যমে আমরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে দুর্যোগকে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা করে থাকি। এর ফলে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে দুর্যোগকে এড়াতে পারি কিংবা দক্ষভাবে জরুরি উদ্ধারকাজ করতে পারি। বর্তমানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দুই ধরনের ধারণা বিদ্যমান :

১. জনপ্রিয় ধারণা : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অনুসরণ করা হয় ত্রাণ তৎপরতা ও দুর্যোগ কমিয়ে আনার ধারণাকে। এই ধরনের অনুশীলনে দুর্যোগ-পরবর্তী জরুরি ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে খাবার, আশ্রয় এবং স্বাস্থ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

এ ক্ষেত্রে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় সকল কর্মকাণ্ড সীমিত থাকে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ, জরুরি পরিকল্পনা, উদ্ধারের প্রস্তুতি, নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বের করা এবং নিরাপত্তা বাড়ানোর চেষ্টার মাধ্যমে দুর্ভোগ লাঘবে। দেখা হয়, কোন কোন এলাকা বেশি দুর্যোগপ্রবণ এবং সেখানে কী কী ধরনের অবকাঠামোগত দুর্বলতা বিদ্যমান। এসব দুর্বলতা বিচার করে ঐসব স্থানে বিভিন্ন অবকাঠামোগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। যেমন—বাঁধ নির্মাণ, দুর্বল অবকাঠামোকে শক্তিশালীকরণ, স্থানান্তর, নির্মাণ কোড মেনে চলা ইত্যাদি।

২. বিবর্তিত ধারণা : সবচেয়ে আধুনিক ধারণা হচ্ছে, উন্নয়ন এবং ঝুঁকি নিরসন। এই ধারণায় দুর্যোগের কারণ কী এবং ঝুঁকি বৃদ্ধির প্রক্রিয়াগুলোকে বিবেচনায় আনা হয়। এ ক্ষেত্রে জনপদের ক্ষয়ক্ষতি ধারণ করার ক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়। দুর্ভোগ লাঘবের জন্য অবকাঠামো-বহির্ভূত ব্যবস্থা নেওয়া হয়; যেমন, নিরাপদ জীবনধারণের ব্যবস্থা, ভালো পরিবেশ, আয় বৃদ্ধি, আগাম পূর্বাভাসের ব্যবস্থা, দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দক্ষতা বৃদ্ধি, জানাশোনা বাড়ানো, ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা, ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের উদ্যোগ।

এ ধরনের অনুশীলনে যেসবের ওপর জোর দেওয়া হয় তা হলো : বিভিন্ন ধরনের বিপত্তি, ঝুঁকি, ক্ষমতা এবং যেকোনো দুর্যোগ ঘটার আগে জনগণ তার ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা রাখে কি না তা বোঝা। বিদ্যমান দুর্যোগ মোকাবিলায় কৌশলগুলোকে আরো ধারালো করে তোলার ক্ষেত্রে স্থানীয় সমাধানের ওপরও জোর দেওয়া হয়। এই ধারণায় বলা হয়, জনপদের ঝুঁকিকে বস্তু হিসেবে না দেখে বিষয় হিসেবে দেখা উচিত। স্থানীয় জ্ঞান-প্রযুক্তিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের সঙ্গে মিলিয়ে দুর্যোগকে মোকাবিলা করা হয়।

গ. বিপদাপন্নতা বা Vulnerability

ষাটের দশক থেকে লক্ষ করা যায় যে, দুর্যোগের ফলে মৃত্যু কিংবা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা ঠিক এ কারণে ঘটছে না যে দুর্যোগের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। বরং এটা ঘটছে এ কারণে যে জনসংখ্যা অনেক বেড়ে যাওয়ায় মানুষের ওপর দুর্যোগের প্রভাব প্রকট হচ্ছে এবং দুর্যোগে মানুষের বিপদাপন্নতাও সেভাবে বাড়ছে।

মানুষের বিপদাপন্নতা বাড়ে তার আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের কারণে। ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা যায়, যদি আমরা দেখি বিপৎসংকুল স্থানে মানুষ কোনো ধরনের বসতি গড়ে। চট্টগ্রামে পাহাড়ের ঢালের বস্তি কিংবা উপকূলের দ্বীপগুলোর যে জনবসতি সেখানে সবাই কিন্তু দরিদ্র। দারিদ্র্য ছাড়াও আরো কিছু প্রচ্ছন্ন কারণ আছে, যা মানুষকে বিপৎসংকুল স্থানে বসতি গড়তে উৎসাহিত করে। তা হতে পারে সাংস্কৃতিক কিংবা রাজনৈতিক। কোনো কোনো জনপদ অন্য আরো জনপদ থেকে বেশি বিপদাপন্ন, যদিও সব ক্ষেত্রে সাধারণত দরিদ্র মানুষ বেশি বিপদাপন্ন হয়ে থাকে। এর কারণ তাদের জীবনে সুযোগ সীমিত এবং উন্নত ও নিরাপদ পরিবেশ তাদের আয়ত্তের বাইরে। এ ছাড়া শ্রেণী, গোত্র, জাতি, লিঙ্গ, শারীরিক বা সামগ্রিক প্রতিবন্ধকতা কিংবা বয়সও বিপদাপন্নতা বাড়িয়ে তোলে। এ কারণে একই ধরনের দুর্যোগ ভিন্ন ভিন্ন জনপদে ভিন্ন রকমের ক্ষতি ঘটিয়ে থাকে। যেমন, ১৯৭১ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় ৬.৪ ম্যাগনিচিউডের ভূমিকম্প হয়েছিল। ঐ শহরে জনসংখ্যা ৭০ লাখ। অথচ ঐ দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছিল মাত্র ৫৮ জন। আবার পরের বছর নিকারাগুয়ায় ৬ মাত্রার একটি ভূমিকম্প হলে সেখানে প্রাণ হারায় ৬ হাজার মানুষ। এই তারতম্যের মূল কারণ নিকারাগুয়া যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশি বিপদাপন্ন।

উপযুক্ত উদ্যোগের মাধ্যমে যেকোনো জনপদের বিপদাপন্নতা কমানো সম্ভব। বাংলাদেশে উপকূলের মানুষ অত্যন্ত বিপদাপন্ন পরিবেশে থাকে। কিন্তু এই বিপদাপন্নতার মাত্রা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হয়েছে বিভিন্ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। এজন্যই যেখানে ১৯৭০ সালের নভেম্বরে সাইক্লোনে ভোলায় প্রায় ৩ থেকে ৫ লাখ মানুষ মারা গিয়েছিল; আর ২০০৭ সালের নভেম্বরে একই শক্তিমত্তার সাইক্লোন সিডরে মারা গিয়েছিল ৩,৪৪৭ জন লোক।

ঘ. স্থানীয় জনপদভিত্তিক দুর্যোগ মোকাবিলা

দুর্যোগ মোকাবিলার সবচেয়ে আধুনিক ধারণা হচ্ছে, এর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে স্থানীয়দের এর আওতায় নিয়ে আসা। এটা দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, স্থানীয় জনপদে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানো হলে আর অবকাঠামোগত সহায়তা দেওয়া হলে মানুষ দুর্যোগ মোকাবিলায় মূল ভূমিকা রাখতে পারে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে প্রচলিত ধারণায় ত্রাণ-পুনর্বাসন কর্মসূচিতে স্থানীয় জনপদের ভূমিকার কোনো স্থান নেই, কারণ এ ক্ষেত্রে জনপদ হচ্ছে সমস্যার কারণ। বহিরাগত বিশেষজ্ঞরা তাদের মনে করেন পরিস্থিতির শিকার, যারা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি দিয়ে লাভবান হচ্ছে। কিন্তু স্থানীয় জনপদকে অংশীদার করলে দুর্যোগ মোকাবিলার পদক্ষেপগুলোর ফলাফল হবে দীর্ঘস্থায়ী। এ ক্ষেত্রে জনপদকে সম্পদ হিসেবে দেখতে হবে। কারণ এতে প্রতিটা জনপদ নিজ থেকে কিছু সমাধান দিতে পারে এবং পরনির্ভরশীলতা কমাতে পারে। স্থানীয় জনপদ অভিজ্ঞতা থেকে কখনো কখনো দুর্যোগের পূর্বাভাসও করতে পারে, কারণ তারা তাদের পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞাত। স্থানীয় জনপদের আরেকটা দিক হচ্ছে, তাদের টিকে থাকার জ্ঞান আছে। তারা তাদের এলাকার সত্যিকারের অগ্রাধিকারগুলো বাইরের একজন বিশেষজ্ঞ থেকে ভালো বোঝে।

তবে স্থানীয় জনপদের ক্ষমতা সীমিত, বিশেষ করে যখন দুর্যোগ আঘাত হানে। তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগাতে হলে স্থানীয় জনপদকে দিতে হবে সম্পদ, সময়মতো তথ্য, প্রযুক্তিগত সহায়তা, সাংগঠনিক সহায়তা, সরকারি ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত সহায়তা।

ঙ. এক নজরে বাংলাদেশের দুর্যোগসমূহ

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গঠনটা এমন ধরনের, যা বাংলাদেশের জন্য একই সঙ্গে আশীর্বাদ ও অভিশাপ। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বদ্বীপটি মূলত সমতল এবং বন্যাভূমি (Flood Plain)। একদিকে প্রচুর বৃষ্টিপাত, অন্যদিকে কয়েকশ নদী এবং উর্বর জমিসমৃদ্ধ ভূ-ভাগ। এ দেশটি প্রাকৃতিকভাবে খুব সহজে ফসল দেয়, বনাঞ্চল সৃষ্টি করে এবং ব্যাপক প্রাণবৈচিত্র্যকে (Bio-diversity) ধারণ করে। সহজ ফসল এবং অন্যান্য খাদ্যের প্রাচুর্যের জন্য এ দেশে বিশাল জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আবার এই প্রাকৃতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি এ দেশে রয়েছে নিয়মিত কিছু দুর্যোগ—বন্যা, সাইক্লোন কিংবা টর্নেডো।

এ দেশের কৃষির জন্য নিয়মিত বন্যা উপকারী। আবার এই বন্যায় কৃষক ও নিচু অঞ্চলের মানুষ কিছু নিয়মিত ক্ষতির মুখোমুখি হয়। বন্যার সময় নদী দিয়ে নতুন পলিমাটি নিচু জমিকে উর্বর করে তোলে এবং ধীরে ধীরে ভূমির উচ্চতা বাড়ায়। কিন্তু এসব নিয়মিত বন্যার বাইরে কখনো কখনো প্রবল বন্যা হয়ে থাকে। যেমন, ১৯৮৮ কিংবা ১৯৯৮-এর বন্যা দেশের অধিকাংশ অঞ্চলকে দীর্ঘ সময়ের জন্য নিমজ্জিত করে রেখেছিল। বহু মানুষ এ ধরনের বন্যায় মারা যায়, সম্পদ হারায় এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। বন্যার পাশাপাশি নদীভাঙনও মানুষকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বৃষ্টি ও নদীবাহিত নিয়মিত বন্যা ছাড়াও বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চল—সিলেট ও পার্বত্য

চট্টগ্রামে পাহাড়ি ঢলজনিত আকস্মিক বন্যায় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। নিয়মিত বন্যায় মানুষ আগাম ধারণা পেলেও আকস্মিক বন্যার কোনো পূর্বাভাস থাকে না বলে এ ধরনের বন্যায় তুলনামূলক ক্ষতি হয় বেশি। আকস্মিক বন্যা সৃষ্টি হয় উঁচু পাহাড়ে অল্প সময়ে অধিক বৃষ্টির মাধ্যমে। এই বৃষ্টি পাহাড়ের পাদদেশীয় এলাকায় নাও হতে পারে। পাহাড়ের বৃষ্টির পানি একত্রীভূত হয়ে একটি নির্দিষ্ট পথ দিয়ে যখন নিচে নেমে আসে তখন তা ভয়াবহ শক্তি নিয়ে আঘাত হানে।

এ ছাড়া সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী জলোচ্ছ্বাসের কারণে সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত নদীগুলোয় বন্যা হয়ে থাকে। এ ধরনের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক হয়ে থাকে ঘূর্ণিঝড়ের শক্তির কারণে।

যদিও বাংলাদেশ পানির দেশ, এ দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রায়ই খরা ভাব উপস্থিত হয়। এ দেশে শীতকাল আবার বেশ শুষ্ক। যদি মৌসুমি আবহাওয়ার প্রভাব বিলম্বিত হয়, তাহলে কোনো কোনো অঞ্চল দ্রুতই খরার মুখোমুখি হতে পারে। ফলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা ইদানীং গবেষণা করে দেখেছেন যে, এ দেশে জলবায়ু ধরন পাল্টাচ্ছে। যদিও বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন বিগত পাঁচ দশক ধরে প্রায় একই রকম আছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, ইদানীং অল্প সময়ে বেশি বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং বর্ষাকালে দীর্ঘসময় বৃষ্টিপাত হচ্ছে না। জলবায়ু বিজ্ঞানীরা প্রাথমিকভাবে মনে করেন, এটি পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হচ্ছে।

অত্যধিক জনসংখ্যা এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে বাংলাদেশ ভূমিকম্প-ঝুঁকির মুখোমুখি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ঢাকা বিশ্বের একটি অন্যতম ভূমিকম্প-ঝুঁকির মুখোমুখি শহর। ঢাকার ভূমিকম্প-ঝুঁকি যে কল্পকথা নয় তা প্রমাণিত হয়েছে ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ভূমিকম্পে। দুই মিনিটের এই ভূমিকম্প, যার উৎপত্তি ছিল সিকিমে, মানুষকে করেছিল সন্ত্রস্ত। সৌভাগ্যক্রমে উৎপত্তিস্থল দূরে হওয়ায় এখানে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

বাংলাদেশের আরেকটি দুর্যোগ হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততা। অবাধ সামুদ্রিক চিংড়ি চাষের জন্য চিংড়িচাষিরা উপকূলবর্তী অঞ্চলে লোনা পানি টেনে এনে এবং তা বাঁধ দিয়ে সংরক্ষণ করার মাধ্যমে এই লবণাক্ততা এখন উপকূল ছাপিয়ে কাছাকাছি জনপদেও আক্রান্ত হচ্ছে। অন্যদিকে অবৈজ্ঞানিকভাবে বা অপরিকল্পিতভাবে সরকারের তৈরি উপকূলীয় বাঁধ বিভিন্ন সময়ে জলোচ্ছ্বাসে আসা লোনা পানি আটকে রাখছে। এই লবণাক্ততা ফসলি জমিতে ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ে কৃষিকাজ অনেকাংশ ব্যাহত করছে এবং খাওয়ার পানির (স্বাদু পানি) অভাব সৃষ্টি করছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে আর্সেনিক বিষক্রিয়া হচ্ছে আরেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাংলাদেশের ভূগর্ভ স্তরে প্রাকৃতিকভাবে আর্সেনিক খনিজ বিদ্যমান। কিন্তু তা শত শত বছর মানুষকে আক্রান্ত

করেনি। ষাট ও সত্তরের দশকে দেশে ব্যাপকভাবে গভীর টিউবওয়েল ব্যবহার জনপ্রিয়তা পায়। সাদা চোখে এই টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক থাকার কথা কেউ কখনো ভাবেনি। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে এসে চিকিৎসকেরা প্রথম লক্ষ করেন যে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত রোগীরা একের পর এক আসছে। পরবর্তী অনুসন্ধানে দেখা যায়, দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক আছে। এর বিষক্রিয়ায় মানুষ ধুঁকে ধুঁকে উৎপাদনশীলতা হারাচ্ছে ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত এই সংকটের আশানুরূপ সমাধান হয়নি।

এ ছাড়া, চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসেও প্রতিবছর অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। ভূমিধসের মূল কারণ অবৈধ ও অবাধভাবে পাহাড় কেটে সবুজ আস্তরণবিশিষ্ট মাটি সরিয়ে ফেলা। এর ফলে বর্ষাকালে খুব সহজেই পাহাড়ের মাটি ধসে পড়ে এবং এর নিচু এলাকায় বসতিতে প্রাণহানি ঘটায়।

চ. জাতীয় দুর্যোগ নীতি ও পরিকল্পনা

বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবিলার আইনগত ভিত্তি হলো ১৯৯৭ সালের দুর্যোগসংক্রান্ত আদেশ। এই আইন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ, অধিদপ্তর, কিছু বিশেষ সেল ও কমিটির ওপর স্পষ্টভাবে কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে। সরকার বর্তমানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন তৈরি করছে। আইনে বর্তমান চর্চাগুলো রেখে বিশেষ কিছু বিষয় রয়েছে।

এই আইনের লক্ষ্য হলো—

ক. বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগসৃষ্ট সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা,

খ. দক্ষভাবে বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা,

গ ঝুঁকি নিরসনকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল বিষয় হিসেবে অঙ্গীভূত করা.

ঘ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করা।

এই আইন ছাড়াও আরো কতগুলো পরিকল্পনা ও নীতি রয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি এবং ঝুঁকি নিরসনের নীতির মাধ্যমে দুর্যোগবিষয়ক জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করা, জরুরি ব্যবস্থাপনা এবং কৌশলগত কাঠামো নির্ধারণ করা। এসবের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জাতীয় নীতিও স্পষ্ট হয়েছে। এই দলিলটি মূলত কৌশলগত এবং এটি বিস্তৃতভাবে জাতীয় লক্ষ্য ও কৌশলকে বর্ণনা করেছে।

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনাটি কৌশলগত দলিল, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রণীত। এর আওতায় আছে বিভিন্ন খাতওয়ারি পরিকল্পনা, যা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং

বিভাগগুলো তৈরি করে। যেহেতু খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নেতৃত্ব দেয়, সেহেতু সেটি দুর্যোগ-ঝুঁকি নিরসন এবং জরুরি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত পরিকল্পনা তৈরিতেও নেতৃত্ব দেয়।

এ ছাড়া এর আওতায় রয়েছে দুর্যোগ মোকাবিলা-সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা, যেমন— বন্যা মোকাবিলা পরিকল্পনা, সাইক্লোন ও ঝড়জনিত জলোচ্ছ্বাস-বিষয়ক পরিকল্পনা, সুনামি মোকাবিলা পরিকল্পনা, ভূমিকম্প মোকাবিলা পরিকল্পনা ইত্যাদি।

প্রতিটি জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা বিশদ পরিকল্পনা। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এসব পরিকল্পনা তৈরি করে। বর্তমানে সরকার একটি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি (২০১০-১৫) অনুসরণ করছে। এর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র রচনা করা হয়েছে। ঝুঁকি নিরসন, কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, জীবনযাত্রার নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন বৈষম্য দূরীকরণ হচ্ছে এর লক্ষ্য। এই নীতি দেশীয় প্রেক্ষাপটে রচিত এবং এর লক্ষ্য দুর্বল জনগোষ্ঠী; বিশেষত নারী, শিশু ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনসাধারণ যেন সত্যিকারভাবে উপকৃত হয়। এটা ঝুঁকি নিরসনের সামগ্রিক বিষয়গুলো গ্রহণ করেছে এবং এতে দুর্যোগবিষয়ক সব সংগঠনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. দুর্যোগসংক্রান্ত আদেশ (Standing Orders on Disaster)

দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সব সময় একটি কার্যকরী আদেশের তালিকা সরকার প্রণয়ন করেছে। এতে সুস্পষ্টভাবে দুর্যোগকালীন কোন সংস্থা কী কী দায়িত্ব পালন করবে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

সরকারের সব পর্যায়ে কার্যাবলির নির্দেশিকা

সরকার কার্যকর অনুশীলনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে, যা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, এনজিও, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সুশীল সমাজ অনুসরণ করে। এই নির্দেশিকার কিছু বিষয়বস্তু হচ্ছে :

- ✓ দুর্যোগের অভিঘাত (Impact) এবং ঝুঁকি পরিমাপক নির্দেশিকা
- ✓ স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগকালীন তহবিল ব্যবস্থাপনার নির্দেশিকা
- ✓ জরুরি তহবিল ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
- ✓ স্থানীয় মোকাবিলা পদ্ধতি নির্ণায়ক নির্দেশিকা
- ✓ জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি পরিমাপক নির্দেশিকা
- ✓ ক্ষতি ও প্রয়োজনীয়তা পরিমাপন নির্দেশিকা ইত্যাদি।

ছ. গুরুত্বপূর্ণ দুর্যোগ প্রতিরোধ প্রকল্প

দুর্যোগ প্রতিরোধ করার জন্য অন্যান্য দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন ধরনের কাঠামো রয়েছে। তবে প্রথমদিকে সরকারের দৃষ্টি ছিল বন্যা মোকাবিলা এবং পানিসম্পদকে কৃষিকাজে আরো উৎপাদনশীলভাবে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করা। সত্তরের সাইক্লোনের পর স্বাধীন বাংলাদেশে দুর্যোগ-ঝুঁকি নিরসনের জন্য সরকার উপকূলে ব্যাপকভাবে বনায়ন করে। আশির দশকে শুরু হয় সাইক্লোন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কাজ। এসব আশ্রয়কেন্দ্র পরবর্তী সময়ের সাইক্লোনে বাঁচিয়েছে বিপুল প্রাণ। এক দৃষ্টিতে উপকূলীয় বনায়ন এবং আশ্রয়কেন্দ্র যেভাবে দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যাপক অবদান রেখেছে, বিভিন্ন বাঁধ সেভাবে উপকারে আসেনি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাঁধের কারণে জলোচ্ছ্বাসের পানি বিভিন্ন গ্রামের ভেতর ঢুকে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতারও সৃষ্টি করেছে।

বন্যা ও জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ কিংবা ব্যারাজগুলো নির্মাণ করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। ১৯৫৯ সালে বোর্ডটি গঠন করা হয়েছিল বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতির সমাধানের জন্য। বাঁধ, ব্যারাজ ছাড়াও পানি উন্নয়ন বোর্ড সেচের জন্য খাল খনন এবং ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন নদীর পানি বণ্টন নিয়ে দর-কষার কাজও করত। ১৯৬৪ সালে বোর্ডটি একটি ২০-২৫ বছর মেয়াদি পানিবিষয়ক মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে, যাতে কৃষি ও সেচব্যবস্থার উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়। এতে দুটো প্রকল্প ছিল—বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ। এই দুই প্রকল্পের আওতায় ৫৯টি বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে ৪৯ লাখ হেক্টর জমি বন্যামুক্ত করা হয় এবং ৩১ লাখ হেক্টর জমি সেচসুবিধার আওতাভুক্ত করা হয়। ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের পর বোর্ড উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পর একটি পাঁচ বছর মেয়াদি বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (Flood Action Plan) প্রণয়ন করা হয় ১৯৯০ সালে। কিন্তু ১৯৯৮ সালে যখন আবারও ১৯৮৮ সালের মতো বন্যা দেখা দেয়, তখন বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ২০০০ সাল নাগাদ পানি উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে প্রায় ১ হাজার ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করে। এর মাধ্যমে ৪ হাজার কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে—যা ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, মাগুরা, নাটোর, রংপুর, দিনাজপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলাকে নিরাপদ করেছে। এ ছাড়া সেচের আওতায় আরো ৪৫ লাখ হেক্টর জমিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তী সময়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড আরো ৫০৭ কোটি টাকার একটি প্রকল্পের আওতায় হাওরগুলো উন্নয়নের কাজে হাত দেয়। বাংলাদেশে ৩৩৬টি হাওর এবং ৬৭টি বড় বিল রয়েছে। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত বোর্ডটি ৯ হাজার ১৪৩ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করেছে, যার মধ্যে ৪ হাজার ১৯৯ কিলোমিটার উপকূলবর্তী এলাকায়। এর মাধ্যমে সমুদ্র থেকে প্রায় ১ হাজার বর্গকিলোমিটার ভূমি উদ্ধার করা

হয়েছে। এ ছাড়া বোর্ডটি নির্মাণ করেছে চারটি বড় ব্যারাজ, যা মনু নদ, বুড়ি তিস্তা, তিস্তা ও টাঙ্গন নদীতে অবস্থিত।

পানি উন্নয়ন বোর্ড ৫ হাজার ৭২ কিলোমিটার সেচ খাল খনন, ৩ হাজার ৫১৪ কিলোমিটার নিষ্কাশনপথ তৈরি, ১২ হাজার ৪৪৭টি পানিশক্তি স্থাপনা (Hydraulic Structures) তৈরি, ৯৮টি পাম্প স্টেশন ইত্যাদি তৈরি করেছে। এতে ৫০ লাখ হেক্টরেরও বেশি এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানিনিষ্কাশন-সুবিধা নিশ্চিত করা গেছে।

সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বা Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP) : ২০০৩ সালে সরকার দুর্যোগের ঝুঁকি নিরসণমূলক পদক্ষেপগুলো আরো ভালোভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করে। বর্তমানে দ্বিতীয় পর্যায়ে কার্যক্রমটি ২০১০ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন আছে। এটি খাদ্য ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করছে। এই কার্যক্রমের লক্ষ্যগুলোর মধ্যে আছে :

- ✓ সমন্বিত ঝুঁকি নিরসনমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়নের উপযোগী একটি সুব্যবস্থাপনা-সম্পন্ন ও শক্তিশালী পেশাদার সংস্থা সৃষ্টি করা,
- ✓ গ্রামীণ ও নগর জনপদের ঝুঁকি কমানোর জন্য কাঠামোগত ও কাঠামোবিহীন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি,
- ✓ দুর্যোগ প্রস্তুতি ও দ্রুত উদ্ধার কার্যক্রমকে আরো দক্ষ ও শক্তিশালী করে তোলা,
- ✓ ১৩টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে উন্নতর দুর্যোগ প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

জ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নেতৃত্ব দেয় খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়। ১৯৯৭ সালে মন্ত্রণালয়টি সকল পর্যায়ে একটি সরকারি কার্যাবলির নির্দেশিকা প্রণয়ন করে, যার মাধ্যমে দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ ছাড়া কার্যকরী পরিকল্পনা ও দুর্যোগ-ঝুঁকি নিরসন এবং জরুরি কার্যক্রম-ব্যবস্থার জন্য সরকার অনেকগুলো আন্ত-সম্পর্কিত সংগঠন তৈরি করেছে। এগুলো জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করেছে। জাতীয় পর্যায়ের কিছু সংগঠন :

১. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল : নেতৃত্বে আছেন প্রধানমন্ত্রী। এর কাজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিক্রমণ এবং বিভিন্ন সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া।

২. আন্তমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি : খাদ্যমন্ত্রী এর নেতৃত্ব দেন। এর কাজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও সরকারি সিদ্ধান্ত সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা।

৩. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি : প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি নেতৃত্ব দেন।

৪. সাইক্লোন প্রস্তুতি প্রকল্প বাস্তবায়ন বোর্ড : নেতৃত্ব দেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব। এর কাজ আগত সাইক্লোনের সময় প্রস্তুতি কার্যক্রম নিরীক্ষা করা।

৫. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিসংক্রান্ত টাস্কফোর্স : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মহাব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে এই টাস্কফোর্স দুর্যোগবিষয়ক প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে।

৬. এনজিও সমন্বয় কমিটি : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মহাপরিচালক এই কমিটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এনজিওগুলোর কার্যক্রম নিরীক্ষা ও সমন্বয় করেন।

৭. দ্রুত দুর্যোগ সতর্কতা সংকেত প্রচারসংক্রান্ত কমিটি : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মহাব্যবস্থাপক পরিচালনা করেন। এর কাজ হচ্ছে দ্রুত দুর্যোগের সতর্কতা সংকেত ও পূর্বাভাস বিভিন্ন পর্যায়ে প্রচার ও জানানো নিশ্চিত করা।

এ ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে রয়েছে—

১. জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি : জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত। এর কাজ জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ড নিরীক্ষা করা।

২. উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি : উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডে সমন্বয় এবং নিরীক্ষা করার জন্য **উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার** নেতৃত্বে এটি গঠিত।

৩. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি : এর নেতৃত্বে আছেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। এই কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে থাকে।

৪. পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি : মেয়রের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটি এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে থাকে।

৫. নগর করপোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি : একইভাবে সিটি মেয়রের নেতৃত্বে এই কমিটি সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুর্যোগ ও সাংবাদিকতা

ক. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সংবাদমাধ্যম

১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল, এতে ৩ থেকে ৫ লাখ মানুষ মারা যায়। এ ধরনের ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের জন্য অস্বাভাবিক নয়। একই ধরনের শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে গত দুই যুগে আরো কয়েকবার ঘটেছে। এর মধ্যে ১৯৯১ সালের একটি ঘূর্ণিঝড় ছাড়া অন্য সব ঘটনায় মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা ১০ হাজারের নিচেই ছিল। কারণ কী? কারণ হচ্ছে, সত্তরের ঝড়ের পরে সরকার বেশ কিছু দুর্যোগকালীন পদক্ষেপ নিয়ে উপকূলবর্তী জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা বাড়িয়েছে। অন্যদিকে দুর্যোগ-পূর্বাভাসব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। সেই সঙ্গে সংবাদমাধ্যম-গুলো আগের তুলনায় অনেক বেশি দুর্যোগের পূর্বাভাস মানুষের কাছে তুলে ধরেছে। সেই সঙ্গে দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসনকাজের তথ্য দ্রুত প্রকাশ করার মাধ্যমে ত্রাণ কার্যক্রমের দক্ষতা বাড়িয়ে তুলেছে। আসলে সত্তর-পূর্ববর্তী সময়ে দুর্যোগে সংবাদ-মাধ্যমের ভূমিকা ছিল নগণ্য।

সে সময় সরকারগুলোর দুর্যোগবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। আবহাওয়া পূর্বাভাসব্যবস্থা ছিল খুব দুর্বল। সরকার দুর্যোগ হয়ে গেলে মূলত ত্রাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সবকিছু সমাধানের চিন্তা করত। আর সংবাদমাধ্যমগুলো দুর্যোগ রিপোর্টিংয়ে সরকারি কার্যক্রমে দৃষ্টি রাখত বেশি।

১৯৭০ সালের নভেম্বরে যখন সাইক্লোনটি ভোলায় আঘাত হানে তখন পূর্ব পাকিস্তানের আবহাওয়া নির্ণায়ক যন্ত্রগুলো অকার্যকর ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের আবহাওয়া বিভাগ একটি পূর্বাভাস দিয়েছিল শেষ মুহূর্তে। সংবাদমাধ্যমগুলো তার ভিত্তিতে পূর্বাভাস প্রচার করেছিল রেডিওতে। কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। ভোলার জনগণ পরবর্তী সময়ে সংবাদমাধ্যমগুলোকে বলেছিল যে, হয় তারা সেই পূর্বাভাস শোনেনি, অথবা শুনলেও এর অর্থ বুঝতে পারেনি। পূর্বাভাস ঠিকমতো এবং সময়মতো প্রচার না হওয়ায় এক দিকে বিশাল একটি জনগোষ্ঠী সাইক্লোনের সময় ছিল অপ্রস্তুত, অপর দিকে রাজনৈতিক বৈষম্যের কারণে দুর্যোগ-পরবর্তী উদ্ধার ও ত্রাণকাজও শুরু হয়েছিল দেরিতে এবং অপ্রতুলভাবে। ফলে অসংখ্য মানুষ মারা যায়। সেই ত্রাণ ও উদ্ধার কর্মকাণ্ড সে সময়ের সংবাদমাধ্যমে বর্তমানের তুলনায় অনেক কম প্রচার পেয়েছিল।

কিন্তু বর্তমান যুগে পূর্বাভাসব্যবস্থা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের কার্যক্রমও অনেক বেড়ে গেছে। বর্তমানে সংবাদমাধ্যমগুলো যথেষ্টই পূর্বাভাস ও দুর্যোগ-পরবর্তী রিপোর্টিং করে। সেই সঙ্গে বছরের অন্যান্য সময় দুর্যোগ-ঝুঁকি কমানোর পদক্ষেপ নিয়েও রিপোর্ট করে থাকে। যথেষ্ট পরিমাণ না হলেও সংবাদমাধ্যমগুলোয় ফলোআপ রিপোর্টও হয়ে থাকে।

খ. দুর্যোগ-ঝুঁকিসংক্রান্ত যোগাযোগ ও সংবাদমাধ্যম

দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের সম্পর্ক নিবিড়। সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে মানুষকে জানানো হয়, শেখানো হয় অনেক কিছু, আবার সতর্ক করা হয়। সর্বোপরি, সঠিক তথ্য দিয়ে জনগণকে সঠিক পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করে থাকে সংবাদমাধ্যম। এর ফলে দুর্যোগ-প্রস্তুতি এবং পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য সঠিক নীতি গ্রহণ সহজ হয়। মৃত্যুর হার এবং সম্পদের ক্ষতি কমে আসে। সংবাদমাধ্যম দুর্যোগ-ঝুঁকিসংক্রান্ত যোগাযোগে জড়িত সরকার, এনজিও, ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থা, জাতিসংঘ ও জনপদ। সব দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় যেসব বিষয় জড়িত তা হচ্ছে : ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, ঝুঁকির গুরুত্বক্রম, ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং এসবের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে যোগাযোগ। এই বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন মতামত থাকতে পারে, যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছাতে মতৈক্য তৈরি করে। এই যোগাযোগ-প্রক্রিয়া হচ্ছে দুর্যোগ-ঝুঁকিসংক্রান্ত যোগাযোগ।

এ ধরনের যোগাযোগ বিভিন্নভাবে ঘটতে পারে। এটা সভা, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স, সেমিনার—বিভিন্নভাবে হতে পারে। দুর্যোগের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হতে পারে সংবাদ কিংবা সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণ।

গ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা

সর্বজনীনভাবে সংবাদমাধ্যম তিনটি স্তরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। দুর্যোগের আগে, দুর্যোগের সময় এবং দুর্যোগের পরে।

১. দুর্যোগের আগে

যেকোনো দুর্যোগের আগে সংবাদমাধ্যম দুর্যোগ-ঝুঁকি নিরসন ও প্রস্তুতির ওপর জোর দিতে পারে। সংবাদমাধ্যম তার রিপোর্ট কিংবা ফিচার দিয়ে নীতিনির্ধারক ও ঝুঁকির মুখোমুখি জনপদকে দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করে তাদের প্রস্তুতি বাড়াতে উৎসাহিত করতে পারে। সংবাদমাধ্যম প্রতিবেদনে (মিডিয়া রিপোর্টে) যেসব বিষয় থাকতে পারে, তা হচ্ছে সম্ভাব্য দুর্যোগ-ঝুঁকি ও দুর্যোগ মোকাবিলার দুর্বলতা নিয়ে তথ্য ও দুর্যোগ ঝুঁকির নানা সম্ভাবনা বিশ্লেষণ। আগে থেকেই দুর্যোগসংক্রান্ত সাবধানবার্তা প্রচার করার মাধ্যমে জনগণ সতর্ক হয়ে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে পারে। এ ধরনের সাংবাদিকতা করার ক্ষেত্রে নিচে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করা যায় :

ক. ঝুঁকির উৎস ও মাত্রা বিশ্লেষণ : এর ভেতর যেসব দেখতে হবে তা হচ্ছে নগরায়ণ প্রক্রিয়া, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন এবং প্রাকৃতিক অবক্ষয়। কারণ এ

বিষয়গুলোই মূলত দুর্যোগ-ঝুঁকি বাড়ায়। এই চারটি বিষয়কে দুর্যোগের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত নিলে একজন সাংবাদিক বুঝতে পারবেন, কোন জনপদ কতটুকু দুর্যোগ-ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

খ. পূর্বসতর্কতা : জনগণকে দুর্যোগসংক্রান্ত পূর্ব-সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়া সংবাদমাধ্যমের অন্যতম কাজ। তবে এ ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের মনে রাখতে হবে, এই সতর্কবার্তা যেন বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যভিত্তিক হয়, যাতে মানুষ অযথা ভয় না পায়।

এক নজরে

দুর্যোগ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সংবাদ-প্রবণতা

সমীক্ষায় দেখা গেছে—

দুর্যোগের ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম মূলত ঘটনানির্ভর। বড় কোনো দুর্যোগের ঘটনা ঘটলে সেগুলোর ওপর রিপোর্ট হয়। দুর্যোগের ঝুঁকি-নিরসন এবং এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদনের সংখ্যা খুব কম। তাই দুর্যোগ-বিষয়ক রিপোর্টের বেশিরভাগ অংশ জুড়েই আছে বন্যা ও সাইক্লোনের খবর। টেলিভিশন ও সংবাদপত্র উভয় ক্ষেত্রে একই প্রবণতা লক্ষণীয়। বাংলাদেশ সাধারণত এই দুটি প্রাকৃতিক দুর্যোগই সবচেয়ে বেশি ঘটে থাকে।

যেসব রিপোর্ট হচ্ছে তার বেশিরভাগই সাদামাটা বা 'সারফেস রিপোর্টিং'। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে বা কারণ অনুসন্ধান করে গভীরতাধর্মী রিপোর্টের সংখ্যা খুবই কম যা হয়তো দুর্যোগের আগাম আভাস দিতে পারত।

প্রতিবেদনে ফোকাস ছিল ত্রাণ, মানুষের দুর্দশা ও সামাজিক প্রভাব। এতে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা দিকনির্দেশনার বিষয়গুলো খুব একটা গুরুত্ব পায়নি।

প্রতিবেদনের সঙ্গে অনেক ছবি ছিল, কিন্তু সংবাদমাধ্যমগুলো ক্ষয়ক্ষতি, ভিকটিম, মৃতদেহ এবং ত্রাণ কাজের ছবি বেশি তুলে ধরেছে। উপাত্ত, ছক, মানচিত্র এসব খুব একটা উপস্থাপিত হয়নি।

(এমআরডিআই ইউনেস্কোর সহযোগিতায় দুর্যোগ বিষয়ে সংবাদ-প্রতিবেদনের ধরন যাচাই এবং সাংবাদিকের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। সমীক্ষায় ছয়টি জাতীয় পত্রিকা এবং চারটি টিভি চ্যানেলের ২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বন্যা, সাইক্লোন, ভূমিকম্প, ভূমিধস এবং খরাবিষয়ক সমস্ত প্রতিবেদনের বিষয় ও গুণগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।)

গ. প্রস্তুতিসংক্রান্ত তথ্য : এ ছাড়া সংবাদমাধ্যম যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে তথ্য দেবে, যাতে মানুষ তা অনুসরণ করে যত দূর সম্ভব নিরাপদে থাকতে পারে। এ ধরনের তথ্যে থাকতে পারে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে কীভাবে যাবে, কীভাবে তাদের ফসল বা শস্য নিরাপদ রাখবে বা প্রয়োজনে আগেই ফসল তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করবে, কীভাবে পারিবারিক সম্পদ রক্ষা করবে বা পশুসম্পদ রক্ষা করবে সে বিষয়গুলো।

ঘ. ঝুঁকি নিরসনের জন্য প্রণোদনা : এ ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের লক্ষ্য হবে নীতিনির্ধারক ও সরকারি আমলারা, যারা অনেক সময় রাজনৈতিক বিষয় অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে জনগণের ঝুঁকি নিরসনের বিষয়ে গুরুত্ব কমিয়ে দিতে পারেন। প্রতিবেদনে ঝুঁকি নিরসনের বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়ে তাদের কাজ ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ও প্রণোদিত করা সম্ভব।

ঙ. জনগণের অংশগ্রহণে উৎসাহ দেওয়া : অনেক সময় নীতিনির্ধারকেরা ভুলে যান যে ঝুঁকির সম্মুখীন জনপদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সংবাদমাধ্যমগুলো তাদের প্রতিবেদনে এটি মনে করিয়ে দিতে পারে এবং সেই সঙ্গে ঝুঁকির সম্মুখীন জনপদের মতামত তুলে ধরতে পারে।

২. দুর্যোগকালীন সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা

দুর্যোগ যখন ঘটমান তখন মূল ফোকাস থাকে যত দূর সম্ভব জীবনহানি এড়ানো এবং বিভিন্ন ধরনের বিপদ থেকে প্রাণ বাঁচানোর ওপর। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা এবং সম্ভাব্য সহায়তা, যেমন—খাদ্য, পানি, আশ্রয় ইত্যাদি প্রস্তুত রাখা হচ্ছে দুর্যোগ-ব্যবস্থাপকদের মূল দায়িত্ব। এ সময় সংবাদমাধ্যমগুলো নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারে :

ক. জনগণকে সময়মতো তথ্যভিত্তিক তথ্য দেওয়া। এতে কী ঘটেছে; কী মাত্রায় দুর্যোগ ঘটেছে এবং বর্তমান অবস্থা কী তার বর্ণনা থাকবে।

খ. জনগণকে জানাতে হবে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। যেমন, দুর্যোগকালীন জনপদের কোথায় কোথায় যাওয়া উচিত নয় তা জানানো কিংবা নিরাপদ পানি কীভাবে পাওয়া যাবে তা জানানো।

গ. কর্তৃপক্ষ কিংবা ত্রাণ সংস্থাগুলো কী কী পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে তা জানানো।

ঘ. বিচ্ছিন্ন এবং সেখানে আটকে পড়া মানুষ বা জনপদ সম্পর্কে তথ্য দিয়ে তাদের দ্রুত সাহায্য নিশ্চিত করা। যেমন, দুর্যোগের সময় মানুষ ছাদে কিংবা গাছে আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারে।

ঙ. দুর্গতদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো প্রচার করা। দুর্যোগের সময় কর্তৃপক্ষ হয়তো জরুরি প্রস্তুতি এবং কার্যক্রম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে এবং যারা দুর্যোগের পর বেঁচে আছে তাদের চাহিদার বিষয়ে তেমন নজর নাও দিয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু সংবাদমাধ্যমের ফোকাস দিয়ে এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করা সম্ভব। এতে সময়মতো দুর্গতদের সাহায্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

চ. পরবর্তী পর্যায়ের ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে প্রচার করাও সংবাদমাধ্যমের একটি কাজ। দুর্যোগ-পরবর্তী অবস্থায় বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবিলা না করলে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা দ্রুত বেড়ে যেতে পারে। যেমন, ভূমিকম্পের পর বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়তে পারে কিংবা সাইক্লোনের পর পানির অভাবে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। প্রতিটি দুর্যোগের পর বিভিন্ন ঝুঁকির সৃষ্টি হয়, যা যথাযথ রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে সবার দৃষ্টিগোচর করা যায়।

৩. দুর্যোগ-পরবর্তী সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা

দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার পর সাধারণত আমাদের মূল দৃষ্টিটা থাকে পুনর্বাসন এবং বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা কিংবা বাড়িঘর পুনর্গঠনের দিকে। পুনর্বাসনের পর্যায়ে ভবিষ্যতের ঝুঁকি কমানোর কথা মাথায় রেখে কাজগুলো করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে একই ধরনের দুর্যোগে এই জনপদে যেন আর বড় ক্ষতি না হয়। সংবাদমাধ্যম এ দিকটায় দৃষ্টি রেখে নিম্নে উল্লিখিত কাজগুলো করতে পারে :

ক. সবার কাছে সাহায্যের আবেদন করতে পারে : যেকোনো দুর্যোগের পর ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য আর্থিক, খাদ্য কিংবা অন্যান্য সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো খুব গুরুত্বপূর্ণ। সে সময় সরকার কিংবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হয়তো যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ নাও থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম একটি ভূমিকা রাখতে পারে। বড় দুর্যোগের পর দেখা যায়, বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলো সবার কাছে সাহায্যের আবেদন করে থাকে এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমের সঙ্গে নিজেরাও সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

খ. পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনার সংবাদ পরিবেশন : সরকার, জাতিসংঘ কিংবা দেশি-বিদেশি এনজিওগুলোর জন্য দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনার সংবাদ জনগণকে জানানো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এতে জনগণ, বিশেষত ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী পুনর্বাসনের আগে নিজের মতামত দেওয়ার সুযোগ পায়। কারণ ঐসব পরিকল্পনা যথার্থ নাও হয়ে থাকতে পারে।

গ. পুনর্গঠনে জীবিতদের অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান : দুর্যোগ-পরবর্তী জনপদ পুনর্গঠনে সেই অঞ্চলের দুর্গত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবে সরকার কিংবা জড়িত সংস্থাগুলো বিষয়টি তেমন গুরুত্ব নাও দিতে পারে। এজন্য সংবাদমাধ্যম মানুষের অংশগ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরতে পারে। এর অংশ হিসেবে সংবাদমাধ্যম ঐ জনপদ পুনর্গঠন বিষয়ে জীবিত ব্যক্তিদের মতামত তুলে ধরতে পারে। প্রশ্ন করতে পারে, কীভাবে ঐ জনপদকে তারা পুনর্গঠিত দেখতে চায়।

ঘ. ঝুঁকি নিরসনকে উৎসাহিতকরণ : ভবিষ্যতে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে এখনই সকল পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসনে ঝুঁকি নিরসনের বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে। যেমন, ১৯৯৮ সালের বন্যার পর বেশ কিছু নতুন নকশার বাড়ি তৈরিতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। এই বাড়িগুলোর নকশা ছিল বন্যাবান্ধব অর্থাৎ বন্যায় সেগুলোতে পানি ঢুকবে না। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেসব নকশা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। এ রকম স্থাপনা এবং পরিবেশের উন্নয়নের মাধ্যমে সব ধরনের দুর্যোগ-ঝুঁকি কমানো সম্ভব।

ঘ. দুর্যোগ প্রতিরোধ কি লাভজনক

অনেকে তর্ক করতে পারেন, দুর্যোগ তো প্রতিদিন ঘটছে না। এর প্রতিরোধে আগে থেকেই টাকা ব্যয় হচ্ছে অপব্যয়। তার চেয়ে দুর্যোগ ঘটার পর ত্রাণ ও পুনর্বাসনে টাকা ব্যয় করাই হচ্ছে যথার্থ। এতে ব্যয়ও হতে পারে কম। এ ধরনের যুক্তি বিপজ্জনক। এর মানে হচ্ছে, ঝুঁকিপূর্ণ জনপদে বারবার দুর্যোগে জানমালের ক্ষতি হবে এবং কর্তৃপক্ষ এসে ত্রাণ দেবে। কিন্তু প্রতিরোধ হচ্ছে সব সময়কার। এতে সম্পদ ও জীবন রক্ষা পাবে একবার নয়, বারবার।

তবে দুর্যোগ প্রতিরোধের বিষয়টি সবাই দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখবে না। কারণ এর খরচ হবে এখন, উপকারিতা পাওয়া যাবে ভবিষ্যতে। আবার এর উপকারিতাও পরিমাপযোগ্য নয়; কারণ, উপকারিতাটাই হচ্ছে দুর্যোগ না ঘটা। তাই এর ফলে অর্থনৈতিকভাবে কী লাভ হলো তা হিসাব করা কঠিন। তবে বিশ্বব্যাংক এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভূতত্ত্ব জরিপ সংস্থা (United States Geological Survey) একটি হিসাব করে বলেছে যে ১৯৯০-এর দশকে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে, তার ২৮ হাজার কোটি ডলার ক্ষতি কমিয়ে ফেলা যেত, যদি সেখানে ৪ হাজার কোটি ডলার ব্যয় করে প্রতিরোধ পদক্ষেপ নিশ্চিত করা যেত।

একটা দুর্যোগ প্রতিরোধের পদক্ষেপ মানুষের উৎপাদনশীলতা বাড়ায় এবং তাকে নতুন উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করে। একটি স্থানের নিরাপত্তার উন্নতি সৃষ্টি করে নতুন সুযোগ; অবনতি মানুষকে অন্য স্থানে চলে যেতে উৎসাহিত করে।

যেমন, আইলা ঘূর্ণিঝড়ের পর সুন্দরবনের ভেতরে ও আশপাশে বিস্তীর্ণ এলাকা সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় ঐ অঞ্চলে সব পুকুরের পানি খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে গেছে। পানি ছাড়া জীবন অচল। তাই গ্রামের মানুষ প্রতিদিন বহুদূর থেকে বিশুদ্ধ পানি কলস ভরে আনে। কিছু কিছু গ্রামে মানুষ উদ্যোগী হয়ে নতুন করে পুকুর খনন করে তাতে বৃষ্টির পানি ধারণ করে তাদের সমস্যার সমাধান করেছে। আর যেসব এলাকায় এখনো বিশুদ্ধ পানি নেই সেসব এলাকার মানুষের উৎপাদনশীলতা অনেক কমে গেছে।

ঙ. দুর্যোগ সাংবাদিকতার নৈতিকতা

ভালো সাংবাদিকতা সব সময়ই নৈতিকতার ওপর নির্ভর করে। শুধু চমক সৃষ্টি করা যদি সাংবাদিকতার লক্ষ্য হয়ে থাকে, তখন সেখানে নৈতিকতার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়। এতে একজন দুর্যোগের শিকার ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে উপহাস কিংবা অবজ্ঞার পাত্র। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশ্য মানুষকে সম্মান করে তথ্য দেওয়া। তাই সাংবাদিকদের উচিত, কোন আচরণটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি অগ্রহণযোগ্য তা বুঝে কাজ করা।

এ ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো একজন সাংবাদিককে মনে রাখতে হবে।

ক. সত্যবাদিতা : সাংবাদিকরা গল্প লেখেন না, তারা সত্য তথ্য নিয়ে কাজ করেন। তাদের তথ্য যদি মিথ্যা হয়, তিনি বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবেন এবং তার সাংবাদিকতা নিরর্থক হয়ে যাবে। একজন সাংবাদিককে সত্যবাদিতা সব সময় অনুসরণ করতে হলে তাকে ধর্ম-বর্ণ ও রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্ধ্বে থেকে ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। মতামত প্রকাশের দায়িত্ব সম্পাদকীয় বিভাগের। মনে রাখতে হবে, এক দিনের মিথ্যা কিংবা বিভ্রান্ত সংবাদ অনেক ধরনের সামাজিক সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে। পরবর্তী সময়ে সে সংবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হলে, কেউ সাংবাদিকের ওপর আস্থা রাখবে না।

খ. জনস্বার্থকে সেবা দেওয়া : একটি সংবাদমাধ্যম যে মতাদর্শেরই হোক না কেন, সেটি যদি জনপ্রিয় হতে চায়, তবে তাকে জনস্বার্থকে গুরুত্ব দিয়েই সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। একজন সাংবাদিক যখন জনস্বার্থকে সেবা করার মনোভাব থেকে কাজ করেন, তখন তার কাজের গুণ স্বাভাবিকভাবেই উন্নত হয়ে যায়।

গ. মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি : দুর্যোগ রিপোর্টিং করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের অবশ্যই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে তাদের মার্জিত ভাষায় দুর্যোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তিরা ইতিমধ্যেই অসহায়; তাদের এমন কোনো ছবি তোলা কিংবা বিবরণ দেওয়া উচিত নয়, যা মনে হতে পারে অশ্লীল কিংবা রুচিহীন।

ঘ. ব্যক্তি-গোপনীয়তাকে সম্মান করা : মানুষের ব্যক্তি-গোপনীয়তাকে সব সময়ই সম্মান করা উচিত। তবে জনসেবায় নিয়োজিত জনগণের কাছে দায়বদ্ধ কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনীতিবিদ কিংবা নীতিনির্ধারকদের অনেক ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড জনগণের জীবনকে আক্রান্ত করতে পারে। সেটি জানার অধিকার সাংবাদিক ও জনগণের রয়েছে। তবে সে ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, যাতে ঐসব ব্যক্তির একান্ত গোপনীয় ব্যক্তিগত বিষয়ে জনসমক্ষে না আসে।

ঙ. সততা : উপহার গ্রহণ কিংবা কাউকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া পরিহার করা উচিত। বিনা মূল্যে ভ্রমণ, বিশেষ সুবিধা গ্রহণ কিংবা দ্বিতীয় কোনো চাকরি

নেওয়া, রাজনৈতিকভাবে জড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদিও সাংবাদিকতার সততাকে আক্রান্ত করতে পারে।

চ. সংবাদসূত্রকে সম্মান করা : সাংবাদিকদের দায়িত্ব শুধু তার পাঠক-দর্শকের কাছে নয়, তার সূত্রদের কাছেও বটে। তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করা একজন সাংবাদিকের নিজের উন্নয়নের জন্যই প্রয়োজন।

ছ. জবাবদিহি : অনেকে মনে করেন, কোনো ভুল করলে চেপে যাওয়াই ভালো। কিন্তু দেখা যায়, সাংবাদিকরা তাদের ভুল মেনে নিয়ে দ্রুত সঠিক তথ্য প্রকাশ করলে তাদের সম্মান বেড়ে যায়। যেহেতু একজন সৎ সাংবাদিক ইচ্ছা করে কোনো ভুল তথ্য লিখবেন না, সেহেতু তার অনিচ্ছাকৃত ভুল স্বীকার করা তার সততা ও একনিষ্ঠতার প্রতীক।

তৃতীয় অধ্যায়

বন্যার পর রিপোর্টিং

ক. বাংলাদেশে বন্যা

বাংলাদেশের ভূপ্রাকৃতিক গঠনের জন্য বন্যা একটা সাধারণ দুর্যোগ। যৌথ নদী কমিশনের মতে গঙ্গা অববাহিকায় এই বদ্বীপের দেশে ৩০০টির বেশি নদী প্রবাহিত হয় এবং যা গিয়ে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। বাংলাপিডিয়ার বাংলাদেশে নদীর সংখ্যা ৭০০ টির ওপর। তবে এসব নদীর অনেকগুলোই দুই অঞ্চলে দুই নামে পরিচিত। বাংলাদেশের ৫০ ভাগ ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০ মিটারের কম উচ্চতাসম্পন্ন । প্রতিবছর ২০ শতাংশ ভূমি বন্যায় আক্রান্ত হয়, আর চরম বন্যার বছর তা ৬৮ শতাংশ পর্যন্ত হয়। তাই বর্ষাকালে এ দেশে বন্যার ঝুঁকি খুবই বেশি। সাধারণত মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাতে নদীতে পানিপ্রবাহ বেড়ে গিয়ে নদীতীরবর্তী জনপদে বন্যা হয়ে থাকে। এটি ঘটে থাকে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে। মৌসুমি বৃষ্টিপাত ছাড়াও এ সময়টিতে হিমালয়ের বরফগলা পানি সংশ্লিষ্ট সব নদীতে প্রবাহ বাড়িয়ে ফেলে। এই দুটি কারণে প্রতিবছরই দেশের প্রায় এক-পঞ্চমাংশে বন্যা হয়ে থাকে। এই সাধারণ বন্যায় সচরাচর প্রতিবছর অনেক মানুষ মারা যায়। লাখ লাখ কাঁচা ঘরবাড়ি নষ্ট হয়।

কিন্তু বাংলাদেশে যুগে যুগে অস্বাভাবিক বন্যারও দেখা মেলে। ১৯৬৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮ এবং ১৯৯৮ সালে এ ধরনের চরম বন্যার মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ। ১৯৯৮-এর বন্যায় দেশের ৬৮ ভাগ ভূমিই ছিল পানির নিচে। সে বছর দেশে যত পানি প্রবাহিত হয়েছিল তার ৯৫ ভাগই ছিল এই বন্যার পানি।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র দিয়ে প্রতিবছর এক ট্রিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি এবং ১ বিলিয়ন টন পলিমাটি বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়। অতএব এই বন্যা যেমন জীবন ও সম্পদ নষ্ট করে, তেমনই এটি আমাদের কৃষির উন্নয়নের জন্যও নিয়ে আসে উর্বর পলিমাটি। ছোটখাটো বন্যা ধান উৎপাদনে সহায়তা করে এবং প্রাকৃতিকভাবেই সেচের কাজটা করে দেয়।

ঐতিহাসিকভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ছয়টি বড় বন্যা রেকর্ড করা আছে। এগুলো হয়েছিল ১৮৪২, ১৮৫৮, ১৮৭১, ১৮৭৫, ১৮৮৫ এবং ১৮৯২ সালে। বিংশ শতাব্দীতে রেকর্ড করা হয় ১৮টি বড় বন্যা, যার মধ্যে ১৯৮৭, ৮৮, ৯৮ এবং ১৯৫৪ সালে বন্যার ভয়াবহতা ছিল ব্যাপক। ২০০৪ এবং ২০১০ সালেও দুটো বড় বন্যা দেখা গেছে, যা অবশ্য '৮৮ সালের বন্যার মতো বড় ছিল না।

১৯৮৭ সালের বন্যায় দেশের ৪০ শতাংশ জুলাই-আগস্ট মাসে ডুবে গিয়েছিল।

১৯৮৮ সালের বন্যা আরো ব্যাপকভাবে দেশের ৬০ শতাংশ আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ডুবিয়ে রাখে। অতিবৃষ্টি এবং নদীতে বেশি পানি প্রবাহের কারণে নাটকীয়ভাবে মাত্র তিন দিনে এই বন্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। রাজাধানী ঢাকাও এতে আক্রান্ত হয়।

১৯৯৮ সালের বন্যায় দেশের ৬৮ শতাংশ ডুবে যায়। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদীর অববাহিকায় অতিবৃষ্টির ফলে এই বন্যার সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে চার ধরনের বন্যা ঘটে থাকে :

- ✓ নদীবাহিত বন্যা
- ✓ বৃষ্টিসৃষ্ট বন্যা
- ✓ পাহাড়ি ঢল
- ✓ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারসৃষ্ট বন্যা

এর মধ্যে নদীবাহিত এবং বৃষ্টিসৃষ্ট বন্যা বা বর্ষণজনিত পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। কখনো কখনো কোনো বৃষ্টি ছাড়াই নদীতে বিপজ্জনক পর্যায়ে পানিপ্রবাহ বেড়ে বন্যা হতে পারে। এর কারণ পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদীর অববাহিকায় অতিবৃষ্টি। এ ছাড়া এই দুই ধরনের বন্যা দেশের অধিকাংশ নিচু অঞ্চলকে আক্রান্ত করে থাকে।

তবে পাহাড়ি ঢল শুধু সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ঘটে থাকে। এ ধরনের ঢলে প্রতিবছর কিছু প্রাণ ও সম্পদহানি হয়। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিবছরই সিলেটের ২০ শতাংশ ভূমি বর্ষার সময় প্রাকৃতিকভাবে ডুবে যায়। এটি হঠাৎ বন্যা নয়।

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এবং জোয়ারসৃষ্ট বন্যা সাধারণত সাইক্লোন কিংবা সুনামি দ্বারা সৃষ্ট। এ ধরনের বন্যা উপকূলবর্তী নদীর আশপাশে ঘটে থাকে। জলোচ্ছ্বাস কিংবা জোয়ারে সৃষ্ট বন্যায় নদীর পানি বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রের লোনা পানিতে উপকূল প্লাবিত হয়। এতে প্রাণ ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এই লোনা পানি পরে সরে গেলেও সৃষ্টি করে খাওয়ার পানির সংকট এবং কৃষিজমিতে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব। যেমন, ঘূর্ণিঝড় আইলায় সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের প্রভাব পরবর্তী কয়েক বছর ধরে এখনো বিদ্যমান।

খ. বন্যা নিয়ন্ত্রণে সরকার ও এনজিওদের ভূমিকা

বন্যা নিয়ে সবার আগে যে সংস্থাটি কাজ করে সেটা হচ্ছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (Flood Forecasting & Warning Centre, FFWC)। পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন এই সংস্থার কাজ হচ্ছে নদীপ্রবাহ ও বন্যার সম্ভাবনার ওপর নজরদারি করা। এই কেন্দ্রের কাছে বৃষ্টি এবং নদীর ওপর তথ্যভাণ্ডার আছে যা সাংবাদিক কিংবা বিজ্ঞানী অথবা পরিকল্পনাবিদদের কাজে লাগতে পারে।

আর সার্বিকভাবে বন্যা বা যেকোনো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নেতৃত্বে রয়েছে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।

এ ছাড়া অন্যান্য যেসব সংস্থা সাংবাদিকদের সহায়তা করতে পারে সেগুলো হচ্ছে :

- পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় (MOWR)
- পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO)
- যৌথ নদী কমিশন (JRC)
- সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS)
- ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWN)
- জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত আন্তসরকারি প্যানেল (IPCC)
- বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক মিশন
- বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (WFP)
- কেয়ার বাংলাদেশ (CARE)
- ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন (FAO)
- বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (BDRCS)

এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও বন্যাসহ বিভিন্ন দুর্যোগে ব্যাপক কাজ করে থাকে। যেমন, বাংলাদেশের সাইক্লোন নিরাপত্তা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল সরকার, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং আইএফআরসির (ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেডক্রস অ্যান্ড রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিজ) সহযোগিতায়। রেডক্রিসেন্ট ও আইএফআরসি দুটোই এনজিও। এই প্রকল্পের কারণে লাখ লাখ মানুষ সাইক্লোনসহ বড় দুর্যোগের সময় নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে পেরেছে এবং তাতে গত দুই দশকে এ ধরনের দুর্যোগে মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।

যেকোনো দুর্যোগকালীন বা দুর্যোগ-পরবর্তী অবস্থায় পরিস্থিতি সাধারণত সরকারের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। সে ক্ষেত্রে সব দুর্যোগে স্থানীয় এনজিওগুলোর কার্যক্রম অনেক উপকারে আসে।

স্বাধীনতার আগে ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে মাত্র ৪০টি এনজিও ছিল, যার ১৯টাই বিদেশি। বর্তমানে ২২ হাজারের ওপর এনজিও আছে, যার মধ্যে ১৫০টি বিদেশি।

এসব এনজিও একটি অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক রক্ষা করে, যার মাধ্যমে কিছু কিছু এনজিও দরিদ্রদের জন্য সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম (Micro-credit) চালায়। এ ছাড়া কিছু

কিছু এনজিও বন্যা ও সাইক্লোন নিয়ে কাজ করে এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় তারা প্রথাগত কিছু পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। যেমন, বন্যার সময় ভেলা তৈরির জন্য কলাগাছ ও বাঁশের ব্যবহার।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি যেকোনো দুর্যোগে একটি বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৯৭ সালে এটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ চালু করে। এই বিভাগটি বিভিন্ন দুর্যোগের সময় ৪২ হাজারের মতো স্বেচ্ছাসেবীকে কাজে লাগায়। এই স্বেচ্ছাসেবীরা বিভিন্ন জনপদে গিয়ে বন্যা, সাইক্লোন কিংবা ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগে মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে প্রস্তুত থাকে। নিকট অতীতে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ২০০৪-সালের বন্যার সময় আড়াই লাখ মানুষকে মেডিকেল সার্ভিস দিয়েছে।

সাধারণত পশ্চাৎপদ এলাকাগুলোতে দুর্যোগের সময় এনজিওগুলো স্থানীয় জনগণের বিভিন্ন উদ্যোগে সহায়তা করে থাকে।

গ. বন্যার ওপর রিপোর্টিং : কী কী করবেন

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে বন্যা কিংবা সাইক্লোন কিংবা যেকোনো দুর্যোগকে কোনো রিপোর্টিং বিট হিসেবে গণ্য করা হয় না। এর একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে, সব প্রাকৃতিক দুর্যোগই স্বল্পস্থায়ী কিংবা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় ঘটে থাকে। যে কারণে সাধারণত পরিবেশ বিটের রিপোর্টার এবং জেনারেল বিটের রিপোর্টারকে দিয়ে দুর্যোগ রিপোর্টিং করানো হয়। এ ছাড়া জেলা প্রতিনিধিরাও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বাংলাদেশে দুর্যোগ রিপোর্টিংয়ের বিষয় হিসেবে বন্যা হচ্ছে এক নম্বর। প্রতিবছর সাধারণত বর্ষাকালে টিভি কিংবা পত্রিকায় কিছু না কিছু বন্যার রিপোর্ট থাকবেই। এর কারণ হচ্ছে অন্য সব ধরনের দুর্যোগের তুলনায় বন্যা নিয়মিত হয়ে থাকে এবং তার বিস্তৃত বেশ কিছু দিন এবং বেশ কিছু এলাকা নিয়ে থাকে।

বন্যা নিয়ে রিপোর্টিং করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে :

বন্যা-পরিস্থিতি নজরে রাখা : বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ কেন্দ্রে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে এবং www.ffwc.gov.bd ওয়েবসাইট দেখে একজন রিপোর্টার বন্যা-পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিদিন ধারণা রাখতে পারেন। এ ক্ষেত্রে কোন কোন নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর চলে গেছে, তা খেয়াল রাখতে হবে। এসব তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্টার কখন এবং কোথায় গেলে বন্যার ভালো কাভারেজ করতে পারবেন তার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

স্পট কাভারেজ : রিপোর্টার যদি দুর্যোগ-আক্রান্ত স্থানে না যান এবং সেখানকার মানুষদের সঙ্গে কথা না বলেন, তবে তিনি কখনোই দুর্যোগের প্রকৃত রূপ জানতে পারবেন না। দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কষ্টও অনুভব করতে পারবেন না। অতএব ভালো ও ইনডেপ্থ রিপোর্টিংয়ের জন্য তাকে স্পটে যেতে হবে।

- স্পট কাভারেজের আগে ঠিক করে নিতে হবে, রিপোর্টার কোন কোন জায়গায় যাবেন এবং তিনি কী কী কাজ করবেন;
- কীভাবে রিপোর্ট পাঠাবেন। সঠিক প্রস্তুতি আছে কি না।
- আক্রান্ত স্পটে রিপোর্টার কাজ করার ক্ষেত্রে কার কার সহযোগিতা পেতে পারেন।

মাঠ পর্যায়ে রিপোর্টিং : মাঠ পর্যায়ে একজন রিপোর্টার কিছু সুনির্দিষ্ট কাজ করবেন :

- আক্রান্ত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে ক্ষয়ক্ষতি দেখা।
- যারা বন্যায় পানিবন্দী—বাড়ির ছাদে কিংবা গাছের ওপর আশ্রয় নেওয়া লোকজনের সঙ্গে কথা বলা।
- আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়ে দুর্গত মানুষের সাক্ষাৎকার নিতে হবে।
- বন্যাকবলিত মানুষের কাছে আপনার জানার বিষয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি কখন, কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অতীতেও তার একই ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল কি না। বর্তমান অবস্থায় কী কী অসুবিধা হচ্ছে এবং কী ধরনের সহায়তা তারা আশা করছে।
- যারা ত্রাণ ও সহায়তার কাজে নিয়োজিত, তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা নেওয়া। যদি দুর্গত মানুষের ত্রাণ ও সহায়তা নিয়ে অভিযোগ থাকে তা তাদের জানানো এবং তা নিয়ে প্রশ্ন করা।
- মাঠপর্যায়ে বন্যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতা নেওয়া এবং অব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর নেওয়া।
- মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্য কার্যক্রম নজরে রাখা। উদ্বাস্তুরা আশ্রয়কেন্দ্রে কী অবস্থায় আছে এবং তারা খাদ্য ও স্বাস্থ্য-সহায়তা পাচ্ছে কি না।
- প্রতিটা মানুষের নিজস্ব গল্প আছে। কারো গল্প থেকে দুর্যোগের সাধারণ বর্ণনা পাওয়া যেতে পারে। আবার কারো গল্প হতে পারে মানবিক আবেদনসম্পন্ন আলাদা রিপোর্ট। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি তার জীবদ্দশায় বন্যার কারণে বারবার নিঃস্ব হয়ে থাকে—তাকে নিয়ে মানবিক আবেদনের রিপোর্ট করা যায়।

- ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম নিয়ে রিপোর্ট থাকবেই। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম যত আন্তরিকই হোক, দুর্যোগ চলাকালীন ও পরবর্তী সময়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসনে কিছু না কিছু ঘাটতি কিংবা সমন্বয়ের অভাব থাকবে। অনেক সময় কিছু দুর্গত অন্যদের থেকে পশ্চাৎপদ এবং যোগাযোগবিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে। এদের আবার পানি কিংবা অন্যান জরুরি চাহিদা থাকতে পারে, যা হতে পারে একজন রিপোর্টারের প্রতিপাদ্য।

ফলোআপ : বন্যা যত বাড়বে স্পট রিপোর্টিং তত বাড়বে। বন্যা যখন কমতে থাকবে তখন ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের ওপর নজর দেওয়ার পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের ওপর রিপোর্টিংয়ে মনোযোগী হতে হবে।

সাধারণত বন্যা-পরবর্তী সময়ে রোগের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। পুনর্বাসনে অনিয়ম ঘটে। এসব সময় সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি রিপোর্টার দুর্গত লোকজন ও বিশেষজ্ঞদের মতামত তুলে ধরবেন; যাতে বোঝা যায়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঠিকমতো হচ্ছে কি না।

বন্যা-পরবর্তী কাভারেজ : যদি বন্যার আকার ব্যাপক ও ভয়াবহ হয়ে থাকে, তাহলে বন্যা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অনেক ধরনের সংবাদ হতে পারে। এর ফোকাস হতে পারে :

- জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক চিত্র।
- পুনর্বাসনকাজের প্রকৃত কার্যকারিতা।
- পুনর্বাসনকাজে ভবিষ্যতের ঝুঁকি কমানোর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি না, তা দেখা।
- বন্যাদুর্গতদের পুনর্বাসন-পরবর্তী জীবনধারা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুতি, পূর্বাভাস এবং পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন।

ঘ. বন্যার ওপর রিপোর্টিং : কিছু টিপস

বন্যার ওপর রিপোর্ট করার সময় রিপোর্টারদের কিছু ব্যবহারিক বাস্তবতা মাথায় রাখতে হবে। বন্যা কাভারেজের সময় রিপোর্টারকে অস্বাভাবিক এবং প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করতে হয় বলে তাকে কিছু প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নামতে হবে। নিচে কিছু প্রস্তুতির টিপস উল্লেখ করা হলো :

১. যে এলাকায় যাচ্ছেন সেখানে যোগাযোগের ব্যবস্থা কী।

২. সেখানে পরিচিত কেউ আছে কি না—স্থানীয় সাংবাদিক কিংবা অন্য কেউ। পরিচিত লোকের সাহায্য নিলে দুর্গত এলাকায় আসা-যাওয়া করার সময় বাঁচবে এবং দক্ষভাবে সময়কে ব্যবহার করতে পারবেন। পরিচিত না থাকলে ত্রাণকর্মী কিংবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সাহায্য নেওয়া সমীচীন। রিপোর্ট করতে গিয়ে নিজে বিপন্ন পরিস্থিতিতে পড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

৩. প্রয়োজনীয় অর্থ রাখবেন। দুর্গত এলাকায় মূলত আপনি নিজের ওপর নির্ভরশীল।

৪. মোবাইল ফোন ও চার্জার খুব সংগত কারণেই নিতে ভুলবেন না। সে ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে, কোন এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয় অথবা বিদ্যুৎ আদৌ নেই।

৫. খুব ছোট কিন্তু উপকারী টিপস : আপনার ব্যাগে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ রাখবেন, যাতে আপনার মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক ও ক্যামেরার মতো সরঞ্জাম রাখতে পারেন। বন্যার পানি থেকে এসব যন্ত্রপাতি রক্ষা করতে হবে।

৬. টর্চ ও প্রয়োজনে ছাতা আপনার খুব কাজে আসতে পারে।

৭. সব সময় একটা বিশুদ্ধ খাওয়ার পানির বোতল রাখুন।

৮. আপনার উপস্থিত বুদ্ধি এবং ভালো আচরণ কাম্য। এ দুটি উপাদান আপনাকে যেমন সবার সঙ্গে যোগাযোগে সাহায্য করবে, তেমনই অপ্রত্যাশিতভাবে কর্তৃপক্ষের সাহায্য মিলিয়ে দিতে পারে।

৯. রিপোর্ট পাঠাবেন কী করে তা আগে থেকেই ভেবে রাখুন। তা হতে পারে ফোনের মাধ্যমে। কিংবা ল্যাপটপ দিয়ে ই-মেইল করে কিংবা ফ্যাক্স করে।

১০. দুর্গতদের সঙ্গে সহনশীল এবং ভদ্র আচরণকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ বন্যার রিপোর্টিং হচ্ছে মানবিক বিপর্যয়ের ওপর রিপোর্টিং।

এ ছাড়া রিপোর্ট লেখার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উত্তর দেওয়া উচিত :

- কীভাবে এবং কখন ঘটনা ঘটল।
- কত মানুষ মারা গেছে কিংবা আক্রান্ত হয়েছে।
- কত মানুষ বেঁচে আছে এবং তারা কী অবস্থায় আছে। তারা কী চায়।
- কত ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়েছে।
- এত ক্ষয়ক্ষতি কেন হলো।

- কী কী নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
- বিপর্যয়ের কারণ কী।
- আগে এমন ঘটেছিল কি না। এরপর কি প্রস্তুতি ও পূর্বাভাস-ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে? না হয়ে থাকলে কেন হয়নি।
- ভবিষ্যতের জন্য কী প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
- দুর্গতদের সেবা দেওয়ার কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করছে কি না। কী দায়িত্ব পালন করছে না।

রিপোর্ট লেখার ক্ষেত্রে রিপোর্টারকে আরো মনে রাখতে হবে :

- রিপোর্টটি মানুষের কষ্টকে প্রতিফলিত করছে।
- জনগণ যা জানতে চায়, তা বলা হচ্ছে।
- এই রিপোর্টে পরে কীভাবে কাজ করা যায় তার ধারণা পাওয়া যাবে।
- নির্ভুল ও সময়মতো তথ্য দেওয়া হচ্ছে।
- রিপোর্টের ফোকাসকে সমর্থন করে, এমন উদাহরণ। সাধারণ জনগণের কিংবা বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য দেওয়া হচ্ছে।
- আপনার তথ্য স্বচ্ছ, সহজবোধ্য ও সঠিক।
- তথ্য বিশ্বাসযোগ্য।
- অযথা ভীতি সৃষ্টি করছে না।
- রিপোর্টটি অযথা বড় নয়।
- মার্জিত ভাষায় লেখা রিপোর্ট।

ঙ. ঝুঁকি নিরসনমূলক বিশেষ রিপোর্ট

বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমে দুর্যোগ রিপোর্টিং মূলত ঘটমান দুর্যোগ কাভারেজেই সীমাবদ্ধ। একটি দুর্যোগ শেষ হয়ে গেলে এ বিষয়ে রিপোর্টারের কলমও থেমে যায়। এর অন্যতম কারণ হতে পারে এই যে, দুর্যোগ কোনো সংবাদমাধ্যমেই আলাদা বিট নয়। কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে যখন দুর্যোগ ঘটছে না, তখন দুর্যোগ নিয়ে ভালো বিশেষ রিপোর্ট হতে পারে। এসব রিপোর্টের মূল ফোকাস হতে পারে দুর্যোগের কারণ অনুসন্ধান এবং তার প্রতিকারের উপায় বিশ্লেষণ। এ ধরনের রিপোর্টে রিপোর্টার নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি বিষয়ের ওপর অনুসন্ধান করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে রিপোর্টার বিশেষজ্ঞদের মতামত, বিশ্লেষণ, গবেষণা, সরকারি নীতি ও কার্যক্রম-প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন পরীক্ষা করে দেখবেন। এ ক্ষেত্রে যেসব বিশেষ প্রতিবেদন হতে পারে, তার কিছু কিছু ধারণা নিচে দেওয়া হলো :

বন্যা বিশ্লেষণ : বিশেষজ্ঞ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের সহায়তায় দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দেশে যত বন্যা হয়েছে তার ধারা এবং প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা জলবায়ু পরিবর্তন বোঝার জন্য বেশ কিছু গবেষণা করছেন। এই গবেষণার মাধ্যমে বন্যার ধারণার পরিবর্তন এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য প্রকৃতির পূর্বাভাস করা যেতে পারে।

দুর্যোগসংক্রান্ত নীতিমালা বিশ্লেষণ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নীতিমালাগুলো কি সত্যিই ঝুঁকি নিরসনকে উৎসাহিত করেছে? বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময় যারা দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের মতামত নিয়ে এ ধরনের রিপোর্ট করা যায়।

ঝুঁকি নিরসনমূলক কর্মকাণ্ড নিরীক্ষা : সরকার ঝুঁকি নিরসনের জন্য বিভিন্ন ধরনের আশ্রয়কেন্দ্র এবং বাঁধ নির্মাণ করে থাকে। এসব বাঁধ কি কার্যকর? যেমন, সিরাজগঞ্জ শহরকে ভাঙন থেকে রক্ষা করার জন্য যে বাঁধটি নির্মাণ করা হয়েছে তা বাস্তবে অকার্যকর। বিশেষজ্ঞরা ইদানীং আবিষ্কার করেছেন যে বাঁধটির ডিজাইন ছিল ভুল। এর অর্থ এই যে, এটি নির্মাণ করে একদিকে অর্থ অপচয় হয়েছে, অন্যদিকে বন্যার সময় এটি শহরটিকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

পুনর্বাসনের অর্থ যথার্থভাবে ব্যয় করা হয়েছে কি না : সরকারের পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডের অর্থ বিভিন্ন উৎস থেকে আসে। এতে দেশি-বিদেশি সংস্থাও অংশ নিয়ে থাকে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির কারণে দেখা যায়, এসব পুনর্বাসন-কর্মকাণ্ডে বিপুল অপব্যয় ও অনিয়ম থাকে। এসব ফান্ডের টাকা অদুর্যোগকালীন ও ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়।

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের নিরীক্ষা : দুর্যোগকালে এবং তারপর কর্তৃপক্ষ বড় বড় পরিকল্পনা নিয়ে থাকে। অদুর্যোগকালীন সেসবের বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব দেখা যায়। এর ফলে ভবিষ্যতে জনপদ প্রবল ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৬০ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার সাইক্লোনের ঝুঁকি কমানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষজ্ঞ দলের কাছে উপদেশ চেয়েছিল। ঐ দলটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপকূল সমীক্ষা করে অনেকগুলো পদক্ষেপের সুপারিশ

করেছিল। কিন্তু বৈরী সরকার তার একটিও পালন করেনি। ফলাফল ১৯৭০ সালের সাইক্লোনে ৫ লাখ লোক মারা যায়।

আগে দুর্গত এলাকা নিরীক্ষা : এ ক্ষেত্রে স্পটে গিয়ে রিপোর্টার দেখতে পারেন, বন্যায় চরমভাবে আক্রান্ত মানুষদের জীবনযাত্রায় উন্নতি হয়েছে কি না। তাদের এলাকায় ঝুঁকি নিরসনমূলক কোনো কর্মকাণ্ড হয়েছে কি না।

বিশেষজ্ঞ ও এনজিওদের মতামত নেওয়া এবং আলোচনার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি বন্যা-ঝুঁকি নিরসনের কার্যক্রমের দুর্বলতা বের করা যায়।

সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা নিরীক্ষা : বাংলাদেশের কিছু কিছু নিচু এলাকায় বন্যার প্রভাব অনেক বেশি। সেসব স্থানে ঝুঁকি নিরসনের ফোকাস হওয়া উচিত ভিন্ন। তা হচ্ছে কি না দেখা যেতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়
সাইক্লোন এবং ঝড় রিপোর্টিং

ক. সাইক্লোন, ঝড় ও ঝুঁকিপূর্ণ জনপদ

সাইক্লোন এবং ঝড়ঝঞ্ঝা হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ঘাতক। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত সাইক্লোন আঘাত হানে। বঙ্গোপসাগরের উত্তরে চোঙ্গার মতো ভূমিক অবস্থানের মুখে বাংলাদেশ অবস্থিত থাকায় সাইক্লোন যখন আঘাত হানে, তখন তার সঙ্গে জলোচ্ছ্বাসও হয়; তাতে উপকূলবর্তী লাখ লাখ মানুষ আক্রান্ত হয়। সাইক্লোন, বজ্রঝড়, টর্নেডো—এসব দুর্যোগ জলবায়ু থেকে সৃষ্ট। পৃথিবীর ৮০ ভাগ দুর্যোগ জলবায়ুসৃষ্ট, এর মধ্যে সাইক্লোন অনেক শক্তিশালী এবং প্রলয়ংকরী হতে পারে।

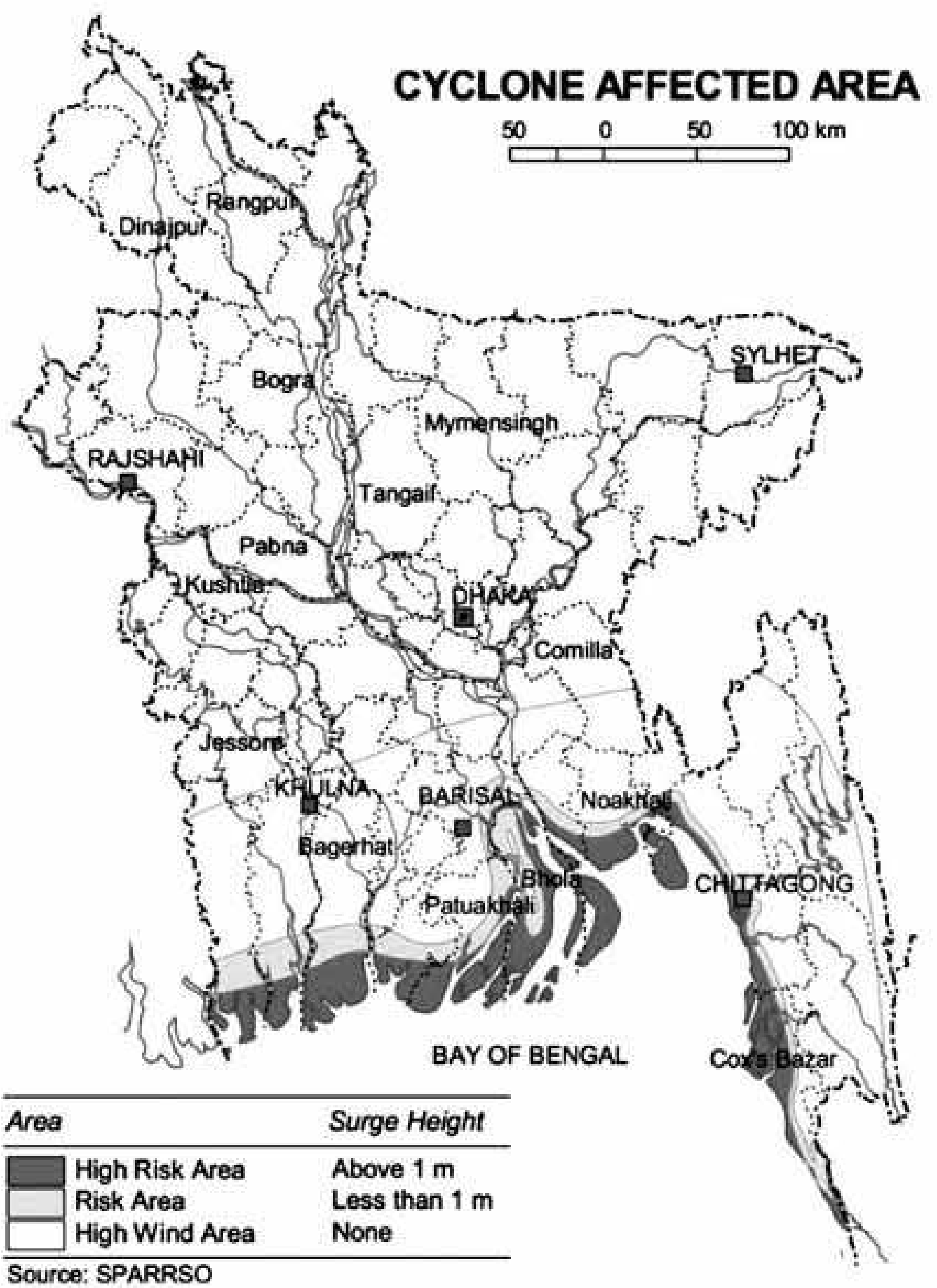

মানচিত্র-২ : সাইক্লোনে আঘাত হানা এলাকা

সাইক্লোন কী : সাইক্লোন সৃষ্টি হয় একটি নিম্নচাপ-আক্রান্ত এলাকায়, যার মধ্যভাগ উষ্ণ এবং যেখানে শক্তিশালী বাতাস পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে প্রবাহিত হয়। শুধু বঙ্গোপসাগরেই পৃথিবীর ৫ শতাংশ সাইক্লোন সৃষ্টি হয়।

সাইক্লোন সাধারণত মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের আগে এবং পরে ঘটে থাকে। অর্থাৎ মার্চ থেকে মে মাস এবং সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসে সাধারণত সাইক্লোন আঘাত হানে।

সাইক্লোন প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত হানতে পারে, যদি তার বায়ুপ্রবাহ ঘন্টায় ১৫০ কিলোমিটার বা তার চেয়ে বেশি বেগে থাকে। বাংলাদেশে কোনো কোনো সাইক্লোন ঘন্টায় ২২৫ কিলোমিটার বেগেও আঘাত হানার নজির আছে।

বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অধিকাংশ এলাকাই সাইক্লোন আক্রান্তের উচ্চ ঝুঁকি বহন করে। এ দেশে বিগত কয়েক দশকে অন্তত ছয়টি সাইক্লোনে ১০ লাখ মানুষ মারা গেছে। এর মধ্যে ১৯৭০ সালে ভোলার সাইক্লোন ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। যদিও এর চেয়ে শক্তিশালী সাইক্লোন হয়েছে ১৯৯১ সালে, যাতে বায়ুপ্রবাহের শক্তি ঘন্টায় ছিল ২২৫ কিলোমিটার । ১৯৭০ সালের সাইক্লোনে মারা গিয়েছিল আনুমানিক ৫ লাখ মানুষ।

বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানা প্রধান সাইক্লোনসমূহ

তারিখ	বছর	বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ (কি.মি/ঘন্টা)	জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা (মিটার)
৩০ অক্টোবর	১৯৬০	২১১	৪.৬ - ৬.১
৩০ মে	১৯৬১	১৬০	৬.১ - ৮.৮
২৮ মে	১৯৬৩	২০৩	৪.২ - ৫.২
১১ মে	১৯৬৫	১৬১	৩.৭ - ৭.৬
১৫ ডিসেম্বর	১৯৬৫	২১৭	২.৪ - ৩.৬
১ অক্টোবর	১৯৬৬	১৩৯	৬.০ - ৬.৭
১২ নভেম্বর	১৯৭০	২২৪	৬.০ - ১০.০
২৫ মে	১৯৮৫	১৫৪	৩.০ - ৪.৬
২৯ এপ্রিল	১৯৯১	২২৫	৬.০ - ৭.৬
১৯ মে	১৯৯৭	২৩২	৩.১ - ৪.৬
১৫ নভেম্বর	২০০৭	২২৩	৫.০
২৫ মে	২০০৯	৯২	২.৪

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ২০০৭
বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রতিবেদন, ২০০৯

১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়ের পর উপকূলবর্তী এলাকায় পরবর্তী দুই দশকে ২০০টির মতো সাইক্লোন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। যখন ১৯৯১ সালে আরেকটি মহাপ্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে, তখন দু-তিন দিন আগে থেকে আগাম সতর্ক সংকেত দিয়ে এবং সাইক্লোন প্রস্তুতি প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে সাড়ে তিন লাখ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। এর পরও ঐ ঝড়ে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৮৮২ জন মানুষ মারা যায়। তবে এতে আরো জীবনহানি ঘটতে পারত। কারণ এই ঝড়টি '৭০ সালের ঝড়ের চেয়েও ছিল বেশি শক্তিশালী। আর শক্তিশালী ছিল বলে এটি সম্পদের যা ক্ষতি করেছিল, তা ১৫০ কোটি ডলারের (বর্তমানের হিসাবে ২০০ কোটি) সমান। সেখানে সত্তরের ঝড়ের ক্ষতি বর্তমানের হিসাবে ধরা হয় ৪৮ কোটি ডলার।

বারবার ঘূর্ণিঝড়কবলিত হওয়ায় বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ঝুঁকি নিরসনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দুর্যোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন নতুন সংস্থা গঠন করেছে এবং তাদের জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য উদ্ধার ও পুনর্বাসনকাজের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশের দুর্যোগসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের পেছনেও মূল একটি কারণ সাইক্লোনের ভয়াবহ ধাক্কা। একই কারণে দেশের দুর্যোগ পূর্বাভাস এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। তবে সাইক্লোনের মতো ব্যাপক ধ্বংসাত্মক দুর্যোগ না হলেও বাংলাদেশে কালবৈশাখী, বজ্রঝড় ও টর্নেডো আরেকটি ভয়াবহ জলবায়ুজনিত দুর্যোগ। সাইক্লোন যেমন সমুদ্রে সৃষ্ট হয়, কালবৈশাখী কিংবা টর্নেডো সৃষ্ট হয় স্থলভাগে। এ ধরনের ঝড় অল্প স্থান নিয়ে সৃষ্টি হয়। এতে বায়ুর নিম্নচাপ থাকে। যত বেশি নিম্নচাপ হবে ঝড়ের শক্তি তত বেশি হবে।

কালবৈশাখী ও টর্নেডো সাধারণত মার্চ-মে মাসে ঘটে। স্থলভাগে এ ধরনের ঝড় সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টিতে আগে থেকে নিখুঁতভাবে পূর্বাভাস দেওয়া যায় না। যদি-বা পূর্বাভাস দেওয়া যায়, তাতে এটা বলা সম্ভব হয় না, কোথায় এবং কখন ও কী শক্তিতে তা আঘাত হানবে।

বজ্রঝড় ঘটে থাকে মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে। বজ্রঝড়ের সময় বজ্রপাতে প্রতিবছর বিপুল মানুষ মারা যায়। এ সময়ের আকাশে বিশেষ ধরনের মেঘ সৃষ্টি হয়, যা দেখতে ফুলকপির মতো। এই মেঘ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং এতে প্রচুর বজ্রপাত ঘটতে থাকে।

কালবৈশাখী ও টর্নেডো তুলনামূলকভাবে অল্প স্থান জুড়ে আঘাত হানে। কিন্তু এসব ঝড়ে বাতাসের গতি ঘণ্টায় ১৫০-৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠে যেতে পারে। এই শক্তির প্রকোপে একটা উড়ন্ত খড় ঢুকে যেতে পারে কংক্রিটের দেয়ালে। ১৯৬৯ সালের ১৪ এপ্রিল ডেমরায় টর্নেডোর গতি ঘণ্টায় প্রায় ৫০০ কিলোমিটার হয়েছিল। সাইক্লোনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যতম একটি দুর্যোগ হচ্ছে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, যার ফলে ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেড়ে যায়।

বাংলাদেশের কয়েকটি ভয়াবহ সাইক্লোন (১৯৭০ ও ১৯৯১ সাল ছাড়া)

১৫৮৪ : বাকেরগঞ্জে (বর্তমান বরিশাল ও পটুয়াখালী) এই ঘূর্ণিঝড়টি পাঁচ ঘন্টাব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। এতে সে সময় প্রায় ২ লাখ মানুষ মারা যায়।

১৮২২ : বরিশাল, হাতিয়া ও নোয়াখালীতে একটি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ৪০ হাজার মানুষ মারা যায়।

১৮৭৬ : একটি ঘূর্ণিঝড়ে ৪০ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসে চট্টগ্রাম, বরিশাল ও নোয়াখালীতে ২ লাখ মানুষ মারা যায়।

১৯৬০ : ঘন্টায় ২১০ কিলোমিটার বায়ুশক্তিসম্পন্ন একটি ঘূর্ণিঝড় চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়াখালীতে ১০ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটায়।

১৯৬৫ : বরিশাল-বাকেরগঞ্জে সংঘটিত এই ঘূর্ণিঝড়ে ১৯ হাজার ২৭৯ জন মানুষ মারা যায়।

১৯৮৫ : চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী এবং উপকূলবর্তী দ্বীপে ঘূর্ণিঝড় এবং ২০ ফুট পর্যন্ত উঁচু জলোচ্ছ্বাসে ১১ হাজার মানুষ মারা যায়।

২০০৭ : দক্ষিণাঞ্চলে সিডর নামক সাইক্লোনে ২ হাজার মানুষ মারা যায়। যদিও সিডরের শক্তি ৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড়ের শক্তির সমান ছিল।

১৯৭০-এর ভোলা সাইক্লোন পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্যে একটি। ১২ নভেম্বর, ১৯৭০ সালের এই দুর্যোগে আনুমানিক পাঁচ লাখ মানুষ মারা যায়। এত মৃত্যুর কারণ ছিল ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস-ব্যবস্থার ব্যর্থতা এবং স্পষ্টভাবে সে সময়ের পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তা জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সরকারের ব্যর্থতা, অনীহা ও অযোগ্যতা।

এই সাইক্লোনটি বঙ্গোপসাগরের মধ্যখানে জন্ম নেয় ৮ নভেম্বর। তারপর ক্রমান্বয়ে শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে এবং উত্তর দিকে ধাবিত হতে থাকে। ১২ নভেম্বর রাতে এটি ঘন্টায় ২২২ কিলোমিটার বেগে ভোলাসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দ্বীপগুলোয় এবং উপকূলবর্তী এলাকায় আঘাত হানে। এই ঝড়ের সঙ্গে জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় গ্রাম আর জনপদ। বর্তমান তজুমুদ্দিন উপজেলার ৪৫ শতাংশ মানুষ মারা যায়।

উপকূলের বেশিরভাগ জনপদ এই ঝড়ের বিপদ সম্পর্কে আগাম জানতে পারেনি, যদিও তারা জানত যে একটা ঘূর্ণিঝড় আসছে। পূর্ব পাকিস্তানের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের আবহাওয়া বিভাগ একটি সতর্ক বার্তা নভেম্বরের ১২ তারিখেই দিনে প্রচার করে। পাকিস্তান রেডিওতে একটি মহাবিপদসংকেতের কথাও প্রচারিত হয়। যারা বেঁচে গিয়েছে তারা পরে বলেছে, এই বিপদসংকেতের অর্থ তারা বোঝেনি।

এ কারণে অল্প কিছু মানুষ যা ঐসব এলাকার ১ শতাংশ মাত্র নিরাপদ আশ্রয়ে সরে গিয়েছিল।

এই ঝড়ের সময় ৩৩ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস ঐসব দ্বীপ ও উপকূলবর্তী এলাকায় বয়ে যায়।

পাকিস্তান রেডিও পরে বলেছিল, ঐসব এলাকার ১৩টি দ্বীপে একজন মানুষও বাঁচেনি। এ ছাড়া দ্বীপগুলোতে ব্যাপক ফসলহানি হয়। প্রায় ৩৬ লাখ মানুষ এই ঝড়ে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

এই দুর্যোগের পরের দিন মাত্র তিনটি মিলিটারি গানবোট ও একটি হাসপাতাল-জাহাজ পাঠানো হয় হাতিয়া, সন্দ্বীপ ও কুতুবদিয়ায়। এসব মিলিটারি টিমের কোনো কোনো দুর্গত অঞ্চলে পৌঁছাতে দুই দিন সময় নিয়েছিল। এক সপ্তাহ পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া স্বীকার করেছিলেন যে দুর্যোগের ভয়াবহতাটা প্রথমে ঠিকমতো বোঝা হয়নি।

খ. সরকার ও এনজিওদের ভূমিকা

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সাইক্লোন খুবই গুরুত্ব পেয়ে থাকে। বন্যা ও সাইক্লোন দুটো দুর্যোগই একই কাঠামোর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা হয়।

তবে ঘূর্ণিঝড়ের জন্য প্রস্তুতি এবং আগাম সংকেত ব্যবস্থাটি অন্য রকম কাঠামোর অধীনে। বাংলাদেশের নিজস্ব উপগ্রহ নেই। এখানে আছে তিনটি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র— বেতবুনিয়া, তালিবাবাদ ও মহাখালী। এই তিনটি অন্য দেশের উপগ্রহ থেকে তথ্য নেয়। বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা (Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organization), যাকে সাধারণভাবে

স্পারসো (SPARRSO) বলা হয়, সেটি মূলত ঘূর্ণিঝড়সংক্রান্ত মেঘমালার ছবির ব্যাখ্যা দেয়। স্পারসো মূলত Nasa ও Noaa-র উপগ্রহ থেকে তথ্য নেয়। আর বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র ঘূর্ণিঝড়সহ সব ধরনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়।

ঘূর্ণিঝড়ের আগে বিপন্ন মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার জন্য ১৯৯১ সালের সাইক্লোনের পর একটি আলাদা প্রকল্প গ্রহণ করে সরকার। যার নাম সমন্বিত সাইক্লোন প্রস্তুতি প্রোগ্রাম (সিপিপি)। এটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি যৌথভাবে পরিচালনা করে। এর আওতায় ৪২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক উপকূলবর্তী অঞ্চলে মানুষদের সাইক্লোন আশ্রয়কেন্দ্রসহ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে প্রস্তুত থাকে। বর্তমানে দেশে ২ হাজার ৫০০ সাইক্লোন আশ্রয়কেন্দ্র আছে। এসব কেন্দ্র উঁচু জায়গায় তৈরি। সাধারণ সময়ে এগুলো স্কুল কিংবা কমিউনিটি কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। অন্যান্য ঝড়জনিত দুর্যোগে উদ্ধারকাজে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (অগ্নি নির্বাপন সংস্থা) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ. সাইক্লোন ও ঝড়ের ওপর রিপোর্টিং

সাইক্লোন কিংবা টর্নেডো ও কালবৈশাখী ঝড়ের সময় রিপোর্টিংয়ের প্রস্তুতি অন্য ধরনের দুর্যোগ থেকে ভিন্ন। সাইক্লোনের ক্ষেত্রে পূর্বাভাস পাওয়ামাত্রই রিপোর্টারের কাজ শুরু হয়ে যায়। টর্নেডো কিংবা বজ্রঝড় বা কালবৈশাখীর ক্ষেত্রে বেশি আগে তেমন কোনো পূর্বাভাস থাকে না। এ ধরনের দুর্যোগ ঘটামাত্র রিপোর্টারকে খুব অল্প প্রস্তুতি নিয়ে দুর্গত এলাকায় ছুটে যেতে হয়।

টর্নেডো কাভারেজ : টর্নেডোজাতীয় শক্তিশালী কিন্তু অল্প এলাকা জুড়ে স্থলভাগের ঝড় কাভারেজের ক্ষেত্রে রিপোর্টারকে অল্প সময়ের ভেতর কিছু প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে যাওয়া উচিত। প্রথমে ঠিক করে নেওয়া উচিত, কী ধরনের যানবাহন নিয়ে যাওয়া যায়। যদি আক্রান্ত এলাকা মূল সড়ক থেকে বেশি ভেতরে হয়, সে ক্ষেত্রে মোটরসাইকেল হতে পারে দ্রুত পৌঁছে যাওয়ার বাহন। এলাকার অবস্থান বুঝে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। আবার সমন্বয় করতে পারলে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়িতেও রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার বা ক্যামেরাম্যান চলে যেতে পারেন। রিপোর্টারকে এটা ধরে নিতে হবে যে যদিও দুর্গত এলাকা মোটরযান চলাচলের আয়ত্তে, কিন্তু তাকে সেখানে হয়তো দীর্ঘ সময় কাজ করতে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে দুর্গত এলাকায় পানি কিংবা খাদ্য হয়তো-বা তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যাবে না।

এ ধরনের দুর্যোগে স্পটে গিয়ে একজন রিপোর্টার যে বিষয়গুলো দেখবেন তা হচ্ছে :

- ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপকতা। টর্নেডো-জাতীয় দুর্যোগে বাড়িঘর ও গাছপালা অবিশ্বাস্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর বিবরণ পাঠক ও শ্রোতাকে ঘটনার ব্যাপকতা বুঝতে সাহায্য করবে।

- বেঁচে যাওয়া মানুষের অবস্থার বিবরণ এই ব্যাপকতাকে আরো পরিষ্কার করে তুলবে। অক্ষত বেঁচে থাকা মানুষের সাক্ষাৎকার নেওয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাকে ঘটনার বিবরণ ও পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করুন। তারা কী চায়, প্রশ্ন করুন। মনে রাখবেন, অক্ষত হলেও তারা এই দুর্যোগের আকস্মিকতায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তাকে এমন প্রশ্ন করবেন না, যা তাকে বিব্রত করে।

- আহত মানুষকে আগে সাহায্য করুন। মানবিকতা আগে। একজন আহত মানুষকে যত দ্রুত উদ্ধার করবেন তত তার প্রাণে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে উদ্ধারের কাজ অভিজ্ঞ উদ্ধারকর্মীদের করতে দিন।

- স্পটে উদ্ধারকর্মীদের কাজে বিঘ্ন না ঘটিয়ে তারা তাদের কার্যক্রমে কীভাবে এই দুর্যোগ-পরিস্থিতি মূল্যায়ন করছে তা পর্যবেক্ষণ করুন।

- তাৎক্ষণিকভাবে এই ঘটনা কাভারেজের সময় হতাহত এবং সম্পদ ধ্বংসের হিসাব জেনে নিন। আহতদের অনেকের হাসপাতালে মৃত্যু হতে পারে।

- ঝড় বিশেষজ্ঞদের মতামত নিন। এ ক্ষেত্রে আগের তুলনায় ঝড়ের ব্যাপকতা বেশি কিংবা কম—এ ধরনের বিষয়গুলো জেনে নিন।

ঘূর্ণিঝড় কাভারেজ : ঘূর্ণিঝড় কাভারেজে একজন রিপোর্টার পূর্বপ্রস্তুতির সুযোগ পায়। কিন্তু এর পরও যখন ঘূর্ণিঝড় কোথাও আঘাত হানে তখন সেখানে যেতে যোগাযোগ-সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। স্পট কাভারেজের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতে হয়। রিপোর্ট পাঠানোর ক্ষেত্রেও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। এ জন্য রিপোর্টারদের সব সময় উপস্থিত বুদ্ধি খাটাতে হবে।

- এ ধরনের কাভারেজের শুরু হয় ঘূর্ণিঝড় পূর্বাভাসের পর্যায় থেকে। বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তথ্যভিত্তিকভাবে ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে জানতে হবে। এ পর্যায়ে রিপোর্টারের কাজ ঝুঁকিপূর্ণ জনপদকে বিশেষভাবে দুর্যোগ-সম্পর্কিত সাবধানতামূলক পদক্ষেপগুলো জানানো; অযথা ভীতি ছড়ানো যাবে না।

- সতর্ক সংকেতের অর্থ কী, এটা ব্যাখ্যা করে দেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোও সাধারণ মানুষের জন্য ব্যাখ্যা করা উচিত।

- ঘূর্ণিঝড় আঘাত করার পর সাধারণত সংবাদমাধ্যমগুলো একাধিক রিপোর্টার স্পটে পাঠায়। স্পটে যাওয়ার ক্ষেত্রে রিপোর্টাররা সবচেয়ে উপদ্রুত এলাকায়

যাওয়ার চেষ্টা করে। এ ধরনের স্পট কখনো কখনো খুবই দুর্গম এলাকায় হতে পারে। সে ক্ষেত্রে উদ্ধারকর্মী, সরকারি বা বেসরকারি দলের সঙ্গে গেলে দ্রুততার সঙ্গে স্পটে পৌছানো যায়। এ ছাড়া স্থানীয় সাংবাদিকরাও খুবই সহায়তা করতে পারেন।

- স্পটে যাওয়ার আগে পলি কিংবা প্লাস্টিক ব্যাগ নেওয়া উচিত। এটা আপনার মোবাইল ফোন, চার্জার কিংবা ল্যাপটপকে পানি থেকে রক্ষা করবে। সঙ্গে খাওয়ার পানি এবং কয়েক দিন কাটানোর মতো আর্থিক প্রস্তুতি নিয়ে যাবেন।
- স্পট থেকে দুই ধরনের রিপোর্ট হতে পারে। ব্রেকিং ও দীর্ঘমেয়াদি দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ের রিপোর্ট।
- দুর্গত জনগোষ্ঠীর বাহ্যিক ও মানসিক অবস্থার ওপর প্রাথমিক রিপোর্ট যত দ্রুত সম্ভব পাঠাতে হবে।
- দুর্যোগ-পরবর্তী দুর্গত মানুষের নিরাপদ অবস্থান নিশ্চিত হয়েছে কি না।
- দুর্গত এলাকার চাহিদা কী? কেউ সাহায্য করছে কি না।
- দুর্গত মানুষ কোথায় গেলে নিরাপদ আশ্রয়, খাবার ও চিকিৎসা সহায়তা পাবে তা উল্লেখ করুন।
- দুর্যোগের সবচেয়ে দক্ষ প্রকাশ ঘটে মানবিক আবেদনসম্পন্ন রিপোর্টে। বেঁচে যাওয়া মানুষদের অভিজ্ঞতা জানুন এবং তাদের দৃষ্টিতে দেখা ঘটনার বিবরণ দিন। তার ক্ষতি ও চাহিদার কথা লিখুন।
- ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের চেষ্টা করুন। ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনা নিন। কী কী অবকাঠামোগত ক্ষতি হয়েছে। জরুরি মেরামতের কাজ আছে কি না।
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম ঠিকমতো হচ্ছে কি না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কিছু অব্যবস্থাপনা হবেই। অযথা তা সমালোচনা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।
- অব্যবস্থাপনার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ত্রাণকাজকে ত্বরান্বিত করা যায়।
- এ ধরনের পরিস্থিতিতে সৌভাগ্যেরও প্রয়োজন আছে। আপনি জানেন না, কার সঙ্গে কথা বললে সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনাটা পেয়ে যাবেন।
- দুর্গত এলাকা থেকে সংবাদ পাঠানো কঠিন হতে পারে। সেজন্য প্রথমে ঠিক করে নিন, কোথা থেকে রিপোর্ট পাঠাবেন এবং কীভাবে।
- পরবর্তী সময়ে দুর্যোগের সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করুন।
- জীবন ও সম্পদের ক্ষতি ছাড়াও দুর্গত এলাকায় ব্যাপকভাবে পরিবেশের ক্ষতি

হতে পারে। যেমন, ২০০৯-এর আইলায় বাঁধ ভেঙে নিরাপদ এলাকায় জলোচ্ছ্বাস হয়। এর ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় খাওয়ার পানির অভাব ঘটে। গাছপালাসহ ফসলের জমি এই লোনা পানিতে এত ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, দুই বছর পরও বহু জায়গায় গাছও নেই, খাবার পানিও নেই। তাই পরিবেশের বিষয়টা নজর রাখতে হবে।

- সাইক্লোনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের ওপর নির্ভর করবে, আপনি কত দিন ফলোআপ রিপোর্ট করবেন। এর কোনো নির্দিষ্ট ফর্মুলা নেই।

ঘ. ঝুঁকি নিরসনমূলক বিশেষ রিপোর্টিং

সাইক্লোন প্রতিবছর হয় না। কিন্তু এর ক্ষয়ক্ষতি এত বেশি হয় যে কোনো কোনো জনপদের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন, আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক এলাকা দুই বছর পরও দুর্গত অবস্থায় আছে। যেখানে দুর্গতি সেখানেই রিপোর্টারদের কাজ। তবে দুঃখজনকভাবে সাংবাদিকেরা এ ধরনের রিপোর্টের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারে না। বাংলাদেশের বাস্তবতায় সাইক্লোনকেন্দ্রিক ঝুঁকি নিরসনমূলক বিশেষ রিপোর্ট প্রায় নিয়মিতভাবে করা সম্ভব।

- সাইক্লোন থেকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য অবকাঠামোগুলো নিরীক্ষা করা যায়। এ ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বাঁধ কিংবা ব্যারাজগুলো দেখতে হবে। এগুলো সত্যিই বিজ্ঞানসম্মতভাবে তৈরি হয়েছিল কি না, এগুলো কি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেরেছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন।
- দুর্গত এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিরীক্ষা করুন। আইলা-ঘূর্ণিঝড়ে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার অন্যতম কারণ চিংড়িচাষিরা বাঁধগুলোতে অসংখ্য ছিদ্র করে গ্রামে চাষের জন্য লোনা পানি আনত। এতে বাঁধগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এ ধরনের বহু ঘটনা পাওয়া যেতে পারে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।
- সরকার কি দীর্ঘমেয়াদি সমাধান দিয়েছে? ক্ষয়ক্ষতিকে পূরণ করতে সরকার যা পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা কি পালন করছে? না করলে কেন করেনি। করে থাকলে তা কী কাজে লাগছে।
- দুর্গত এলাকার জীবনযাত্রা কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে? কৃষকরা চাষ করতে পারছে কি না। জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরতে যাচ্ছে কি না। তাদের চাহিদা পূরণ হচ্ছে কি না। শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে কি না।

- এলাকার মানুষকে কি পুনর্বাসনকাজে জড়িত করা হচ্ছে, নাকি তাদের ওপর বহিরাগত ধারণা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি এলাকার নিজস্ব চাহিদা আছে—তা কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত করতে পারছে কি না।
- পরিবেশের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা কি না। পূরণ করা হচ্ছে? জলাবদ্ধতা আছে কি না। খাওয়ার পানি পাওয়া যাচ্ছে কি না। গাছপালা ও পশুপাখি নিরাপদে আছে কি না।
- যে এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে এত বেশি ক্ষতি হওয়ার কারণ কী?
- ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের স্বনির্ভর করার জন্য সরকার কিংবা এনজিওগুলো কোনো অর্থনৈতিক কর্মসূচি নিয়েছে কি না। সবাই কি ঋণ পাচ্ছে? কেন পাচ্ছে না?
- ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ অন্যত্র অভিবাসন করছে কি না। কেন করছে? ঐ এলাকা কি রাজনৈতিক অবহেলার শিকার?
- বিশেষজ্ঞদের মতে ভবিষ্যতের দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা আরো কমিয়ে আনার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

পঞ্চম অধ্যায়

জলবায়ু পরিবর্তন

ক. জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ঝুঁকি

জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে পৃথিবীর ক্রমান্বয়ে উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত এক বিপর্যয়। অন্যান্য দুর্যোগের সঙ্গে এর মূল পার্থক্য হচ্ছে, এই পরিবর্তন ধীরে ধীরে হচ্ছে এবং এর পরিবর্তন অন্যান্য দুর্যোগের ব্যাপকতাকে বাড়িয়ে তুলছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মূলত একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের গতি বাড়িয়ে তুলে এক অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করেছে শিল্পায়ন ও আধুনিক সভ্যতা।

প্রাকৃতিকভাবে পৃথিবী লাখ লাখ বছরের একটি চক্রে বরফযুগে প্রবেশ করে এবং পরবর্তীকালে উষ্ণযুগে প্রবেশ করে। পৃথিবীর শেষ বরফযুগ শুরু হয়েছিল ২৪ লাখ বছর আগে এবং এটি ধারণা করা হয় ১০ হাজার বছর আগে শেষ হয়েছে। ১৮ হাজার বছর আগে বরফযুগের প্রভাবে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বর্তমানের তুলনায় আরো ২০০ মাইল দক্ষিণে ছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ ছিল বর্তমানের চেয়ে ১২০ মিটার নিচে।

বরফযুগ শেষ হওয়ার আগে থেকে উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাও বাড়া শুরু করে এবং সমুদ্রও এগিয়ে আসে। সেই সঙ্গে ১০ হাজার বছর আগে থেকে এখানে বদ্বীপ গঠন শুরু হয়। ধীরে ধীরে সভ্যতার বিকাশও ঘটতে থাকে।

কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থান এবং ভূগঠনের কারণে এ দেশ দুর্যোগপ্রবণ। একই কারণে অস্বাভাবিক উষ্ণায়নে পৃথিবীতে নিকট ভবিষ্যতে দুর্যোগের অন্যতম শিকার হতে যাচ্ছে এই দেশ।

এই উষ্ণায়নের কারণ কী? বিজ্ঞানীরা উনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কার করেন যে, বায়ুমণ্ডলের কিছু গ্যাস-কণিকা সূর্যের তাপ আটকে রাখে। গত আশির দশকে এসে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, ঐ ধরনের গ্যাস, যেমন— কার্বন ডাই-অক্সাইড কিংবা নাইট্রাস-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে অত্যধিক পরিমাণ তাপ আটকে রাখছে। এই প্রক্রিয়াকে তারা নাম দিলেন গ্রিন হাউস ইফেক্ট। একটি ২৫ কিলোমিটার গভীর গ্যাসের চাদরে কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ কয়েক ধরনের গ্যাস এই তাপ আটকে পৃথিবীর তাপ অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে ফেলছে। এর ফলে অস্বাভাবিকভাবে গলছে দুই মেরুর বরফ; যার ফলে ধীরে ধীরে বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা।

বিজ্ঞানীরা গত দুই লাখ বছরের পৃথিবীর আবহাওয়ার তথ্যকোষ সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে ১৭৬০ সালের পর থেকে পৃথিবীর আবহাওয়ায় অধিক মাত্রায় গ্রিন হাউস গ্যাস জমা হচ্ছে। এই গ্যাসের মাত্রা ১৯৭০-এর পর থেকে অতি দ্রুত বাড়ছে। এর মাধ্যমে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, গত চার যুগ ধরে অতি দ্রুত জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। এই তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রাকৃতিক বিষয়গুলোও বদলাচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্ধেক ভূমির গড় উচ্চতা যেহেতু সমুদ্রপৃষ্ঠের চেয়ে মাত্র ১০ মিটার উচ্চতায়, সেহেতু এই জলবায়ু পরিবর্তনে এ দেশটিকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

বাংলাদেশের ৮৮ শতাংশ জমি সমতল এবং এই অঞ্চলের ৯৩ শতাংশ বৃষ্টির পানি বাংলাদেশের ভূখণ্ড দিয়ে সমুদ্রে পড়ে। বর্ষার সময় যায় ঐ পানির ৮০ ভাগ । তার ওপর বাংলাদেশ অত্যন্ত জনবহুল; অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল; উন্নয়নে পশ্চাৎপদ এবং নানা রকম শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতায় আক্রান্ত। এ জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় এ দেশের ঝুঁকি আরো বেশি।

খ. জলবায়ু পরিবর্তনে কী কী ঘটতে পারে

বাংলাদেশের জলবায়ু বিজ্ঞানীরা মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের ঘটনা ও মাত্রা বেড়ে যাবে। যদিও এখনো পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বাড়েনি। সেই সঙ্গে জলোচ্ছ্বাসের প্রবণতাও বেড়ে যাবে।

- বর্ষায় ভারী এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ঘটবে। এর ফলে নদীর পানি বেশি মাত্রায় বেড়ে গিয়ে অতিরিক্ত বন্যা হবে এবং বাঁধসহ বিভিন্ন স্থাপনার ক্ষতি করবে। নদীভাঙনের পরিমাণ বাড়বে এবং নদীতে বেশি মাত্রায় পলি জমে নাব্যতা কমে যাবে এবং আশপাশের অঞ্চলগুলোয় জলাবদ্ধতা ঘটবে।
- হিমালয়ের গ্লেসিয়ারগুলো উষ্ণ মাসগুলোতে বেশি মাত্রায় গলে নদীর পানিপ্রবাহ বাড়িয়ে তুলবে। গ্লেসিয়ারগুলো যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন শীতের সময় পানিপ্রবাহ খুবই কমে যাবে। এর ফলে ভূ-অভ্যন্তরে সামুদ্রিক লবণাক্ততা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে।
- পরবর্তী সময়ে অনিয়মিত এবং আরো কম বৃষ্টিপাত হবে। এর ফলে খরা বাড়বে; বিশেষত উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে উপকূলবর্তী নিচু এলাকাগুলো ডুবে যাবে এবং লবণাক্ততা দিয়ে উপকূলের নদী ও ভূগর্ভস্থ পানির স্তর আক্রান্ত হবে। সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কৃষিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
- আদ্র ও উষ্ণ আবহাওয়ায় রোগের প্রাদুর্ভাব হবে বেশি মাত্রায়।
- বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ২০৫০ সাল নাগাদ ধান উৎপাদান ১৯৯০ সালের তুলনায় ৮ শতাংশ কমে যাবে এবং গম উৎপাদনও ৩২ শতাংশ কমবে।

- খাওয়ার পানির ব্যাপক অভাব ঘটবে; বিশেষত, উপকূলবর্তী ও খরাপ্রবণ এলাকায়। এর ফলে বিশেষভাবে নারী ও শিশুদের কষ্ট বাড়িয়ে তুলবে; কারণ, তারাই সাধারণত পানি সংগ্রহ করে থাকে। সেই সঙ্গে লোনা পানি পান করে মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটবে।
- নদীভাঙন ও লবণাক্ততা বাড়ার কারণে লাখ লাখ মানুষ হবে গৃহহারা। এরা তখন দেশের ভেতরেই অন্যত্র অভিবাসী হবে। যদি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বাঁধ দিয়ে ঠেকানো না যায়, তাহলে ৬০ থেকে ৮০ লাখ মানুষ হয়তো ২০৫০ সালের মধ্যে বড় শহরে অভিবাসন ঘটিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করবে।
- বর্তমানে সাধারণত ২০ শতাংশ অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হয়। চার দশক পর বর্ষা মৌসুমে ৪৫ শতাংশ অঞ্চল প্লাবিত হবে। সাত দশক পর প্লাবিত হবে ৭০ শতাংশ অঞ্চল ।
- বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল হবে সবচেয়ে দুর্গত এলাকা। ইতিমধ্যেই ঐ অঞ্চলে লবণাক্ততার কারণে দারিদ্র্য বাড়ছে, কৃষি উৎপাদন কমছে। ভবিষ্যতে অবস্থা আরো খারাপ হবে, যদি যথার্থ পদক্ষেপ না নেওয়া হয়।

বাংলাদেশ কি ডুবে যাবে?

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনেক বিজ্ঞানী আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গিয়ে বাংলাদেশের বিশাল এক নিচু অংশ ডুবে যাবে। ১৯৮৮ সালে এক জার্মান বিজ্ঞানী আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে সমুদ্রপৃষ্ঠ ১ মিটার বাড়লে বাংলাদেশের ১৭ শতাংশ ভূমি ডুবে যাবে।

কিন্তু বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা তা মনে করেন না। সেন্টার ফর গ্লোবাল চেঞ্জের নির্বাহী পরিচালক আহসান উদ্দিন আহমদ মনে করেন, এ ধরনের আশঙ্কা বিজ্ঞানসম্মত নয়। তিনি মনে করেন, ২০২১ সাল নাগাদ যদি বাংলাদেশ একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়, তাহলে আমরা এ দেশে নদীতে বহমান বিপুল পলিমাটিকে ইঞ্জিনিয়ারিং করে বাংলাদেশের ভূমির আয়তন বাড়িয়ে তুলতে পারি। তিনি আরো মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে থেকেও বাংলাদেশ প্রাকৃতিকভাবে উপকূলবর্তী অঞ্চলে বেশ কিছু নতুন জমি লাভ করেছে এই পলিমাটি প্রবাহের ফলে।

গ. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সরকারের কৌশল ও পদক্ষেপ এবং বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ ভবিষ্যতের হুমকি মোকাবিলায় কিছু কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা করেছে। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি দুর্যোগের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর কৌশলে বাংলাদেশ অগ্রাধিকার দিচ্ছে । বাংলাদেশ খাপ খাওয়ানোর কৌশলে পৃথিবীতে অন্যতম। এখানে এই কাজে গবেষণা নকশায়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলতে থাকবে। তবে দীর্ঘ মেয়াদে পৃথিবীর জলবায়ু উষ্ণায়নের কারণগুলো সমাধান প্রয়োজন। এজন্য বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য উন্নত বিশ্বের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর উষ্ণায়নের জন্য মূলত দায়ী উন্নত বিশ্বের শিল্পকারখানা ও যানবাহন থেকে নির্গত অত্যধিক পরিমাণ কার্বন। বাংলাদেশ এই কার্বন নির্গমনে অতি নগণ্য অংশগ্রহণ করেছে। এজন্য জাতিসংঘের আওতায় বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সভা হয়েছে। এসব সভায় বেশিরভাগ উন্নত দেশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে তারা কার্বন নির্গমন ধীরে ধীরে কমিয়ে আনবে।

এদিকে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনকে মাথায় রেখে একটি ভিশন ২০২১ প্রণয়ন করেছে। এই ভিশন অনুযায়ী, বাংলাদেশের কৌশল হবে দরিদ্রবান্ধব এবং এখানকার উন্নয়ন হবে অল্প কার্বন নিঃসরণকারী এবং প্রতিকূল জলবায়ু নিরোধক।

এতে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে পুনর্বাসন, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং যথেষ্ট বিনিয়োগের মাধ্যমে খাদ্য, জ্বালানি, পানি, জীবনধারণ ও স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং পদক্ষেপ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাটি বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশলের অংশ। এতে ছয়টি পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে—

১. খাদ্যনিরাপত্তা, সামাজিক ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তা

২. সামগ্রিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

৩. অবকাঠামোগত উন্নয়ন

৪. গবেষণা ও শিক্ষার ব্যবস্থাপনা

৫. পুনর্বাসন ও স্বল্প কার্বন নিশ্চিতকরণ

৬. কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন।

সরকার মনে করে, জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে পদক্ষেপ নেওয়া। এতে সুশীল সমাজ ও ব্যবসা খাতেরও ভূমিকা আছে। তবে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্ষমতা উন্নয়ন এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি করা। উন্নয়নসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করার কার্যকরী পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

খাপ খাওয়ানো কার্যক্রম শুরু করতে ২০১৫ সাল নাগাদ ৫০০ কোটি ডলার প্রয়োজন বলে বাংলাদেশ মনে করে। এজন্য প্রতিবছর বাজেটে বাংলাদেশ ১০ কোটি ডলার নিজস্ব বরাদ্দ রাখছে। একই উদ্দেশ্যে ২০১০-এ সরকার একটি জলবায়ুবিষয়ক তহবিল গঠন করেছে এবং আশা করছে, ঋণদাতারা এতে সাহায্য দেবে।

সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থাগুলো, যেমন—পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন অধিদপ্তর এ ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব পালন করছে। এ ছাড়া রয়েছে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, যার অধীনে আছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো (ডিএমবি) এবং সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (সিডিএমপি); পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, যার অধীনে আছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং বিভিন্ন গবেষণা ও পূর্বাভাস-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান; স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়; কৃষি মন্ত্রণালয়, যার অধীনে আছে জাতীয় কৃষি গবেষণা ব্যবস্থা এবং বৈরী জলবায়ুতে নতুন শস্যবীজ আবিষ্কার ও চাষপদ্ধতিতে পরিবর্তন নিশ্চিত করা; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ, জ্বালানি খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; সড়ক ও রেলপথ বিভাগ; যোগাযোগ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বিভিন্ন প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া।

বাংলাদেশের এনজিও তথা সুশীল সমাজ বেশ তৎপর। সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো দারিদ্র্য নিরসন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষামূলক কাজে অবদান রেখে আসছে। জলবায়ু নিয়ে নির্দিষ্টভাবে ছোট-বড় প্রায় ২০০টি বেসরকারি সংস্থা কাজ করছে।

জাতিসংঘসহ সব বড় বড় ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমানে নিজস্ব জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত সেল রয়েছে।

সর্বোপরি বাংলাদেশ সরকারের সুনির্দিষ্ট সেলটি হচ্ছে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জলবায়ু পরিবর্তন সেল।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে বিভিন্ন উন্নত দেশ বাংলাদেশকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যবশত এ ধরনের সহায়তার এখনো পর্যন্ত বাস্তবিক প্রয়োগ দেখা যায়নি।

ঘ. জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর বিশেষ রিপোর্ট

যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনঘটিত দুর্যোগ ধীর গতিতে বাড়ছে, সেহেতু এর স্পট রিপোর্টিং হয় না। এর কারণে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়, অতিবন্যা কিংবা অন্যান্য ঝড় স্পট রিপোর্টিংয়ের বিষয়বস্তু। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এসব দুর্যোগ ঘটছে কি না, তা সব সময়ই বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে জানতে হবে। তাই এ ধরনের সব রিপোর্টই হবে বিশেষ রিপোর্ট। তবে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক কনফারেন্স কিংবা সরকারের নীতিমালা, আন্তর্জাতিক আলোচনা ও দর-কষাকষি নিয়ে স্পট রিপোর্ট হতে পারে, যা সরাসরি দুর্যোগ রিপোর্টিং নয় কিন্তু দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তা সরাসরি প্রভাব রাখবে। এই বিষয়টির ওপর দেশে ও বিদেশে প্রতিনিয়তই তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে এবং সরকার বিভিন্ন বিষয়ে তার অবস্থান পরিষ্কার করার জন্য বক্তব্য রাখছে, যা একজন রিপোর্টারের নিয়মিত খোঁজ রাখা উচিত। নিচে এ ধরনের রিপোর্ট নিয়ে কিছু ধারণা দেওয়া হলো :

বিশেষজ্ঞদের গবেষণাভিত্তিক রিপোর্ট : বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ২০০টির মতো প্রতিষ্ঠান জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করছে। এর মধ্যে অনেকগুলোই নিয়মিত গবেষণা ও সার্বিক বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করে আসছে। এ ধরনের গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ পূর্বাভাস আসতে পারে। কিংবা কোনো একটি দুর্যোগ ঘটে যাচ্ছে যা খালি চোখে বোঝা যায় না, তা বের হয়ে আসতে পারে।

গবেষণা ও নিরীক্ষা দলিল থেকে একজন রিপোর্টার দুই ধরনের রিপোর্ট করতে পারেন :

✓ দলিলভিত্তিক সরাসরি রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে গবেষণায় কী পাওয়া তা থাকবে এবং সেই সঙ্গে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো কী ভাবছে তা থাকবে।

✓ গবেষণার তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্টার আক্রান্ত অঞ্চল কিংবা দুর্যোগের বিষয়টি নিজের মতো করে দেখবে। আক্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে নিজের দেখা দুর্যোগের ওপর রিপোর্ট করবে এবং সেই সঙ্গে গবেষণায় পাওয়া বিষয়গুলো উল্লেখ করে রিপোর্টকে শক্তিশালী করে তুলবে।

জলবায়ু তহবিলের ব্যবহার কীভাবে হচ্ছে তা অনুসন্ধান করা : এ ধরনের তহবিল যেহেতু বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় অবকাঠামো নির্মাণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা হবে, সে কারণে এই তহবিল ব্যবহার ব্যাপক অনিয়মের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। এখানে অনুসন্ধান করলে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি এবং অপচয়ের সংবাদও পাওয়া যেতে পারে।

সরকারি নীতি পর্যালোচনা করে একজন রিপোর্টার দেখতে পারেন যে যদিও বলা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনকে মাথায় রেখে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে—বাস্তবে তা হচ্ছে কি না। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলাবদ্ধতা কিংবা লবণাক্ততা নিরসনমূলক কাজ হচ্ছে কি না; নাকি সেখানে এমন উন্নয়ন কাজ হচ্ছে যাতে এসব দুর্যোগ আরো ঘনীভূত হচ্ছে।

নদীপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের অস্বাভাবিকতা নিরীক্ষা করে রিপোর্ট হতে পারে। এ ক্ষেত্রে নদী ও আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ ছাড়াও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন নদী অববাহিকা, নদীপ্রবাহ ও নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক উদ্যোগে কোনো কাজ হচ্ছে কি না সে বিষয় আসতে পারে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লবণাক্ততা বৃদ্ধিতে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও (চিংড়ি চাষ) অস্বাভাবিক জলবায়ু পরিববর্তনজনিত দুর্যোগ সৃষ্টি করতে পারে। এ ছাড়া এমনও বলা হয়, ভবিষ্যতে এই অঞ্চলই হবে সবচেয়ে দুর্গত এলাকা। এই বিষয়টি সরজমিনে দেখে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে বিভিন্ন ফোকাসে একাধিক বিশেষ রিপোর্ট হতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের নারী ও শিশুরা বেশি কষ্ট পাবে। একজন রিপোর্টার বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে কিছু দুর্যোগ-আক্রান্ত এলাকায় গিয়ে দেখতে পারেন, আসলে বিষয়টি তেমন কি না।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা-সংক্রান্ত যেকোনো প্রকল্প গ্রহণ করা হলে তা নিরীক্ষা করে দেখা উচিত। এজন্য বিশেষজ্ঞ এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কথা বলে বোঝা উচিত এই প্রকল্প করে লাভ হবে কি না।

যেহেতু বাংলাদেশের খাদ্যনিরাপত্তা এই দুর্যোগ দিয়ে আক্রান্ত। সেজন্য একজন রিপোর্টার কৃষি ও খাদ্যে নতুন উদ্ভাবন নিয়ে রিপোর্ট করতে পারেন।

যেকোনো ধরনের বড় অবকাঠামো নির্মাণে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় আনা হয়েছে কি না তা নিরীক্ষা করে দেখা।

নদীতে বেশি পলি জমে যাওয়ায় নাব্যতা-সংকট এবং তা সমাধানকল্পে সরকার কতটা সিরিয়াস সে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভূমিকম্প

ক. বাংলাদেশের ভূমিকম্প-ঝুঁকি

বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক ভূমিকম্পপ্রবণ ৩০টি দেশর মধ্যে একটি। জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস, আমেরিকা, ফিজি, ইরান, নিউজিল্যান্ড, চিলি, ভারত ও নেপাল সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ।

এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হচ্ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ ও কক্সবাজার। এর মধ্যে ঢাকা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ।

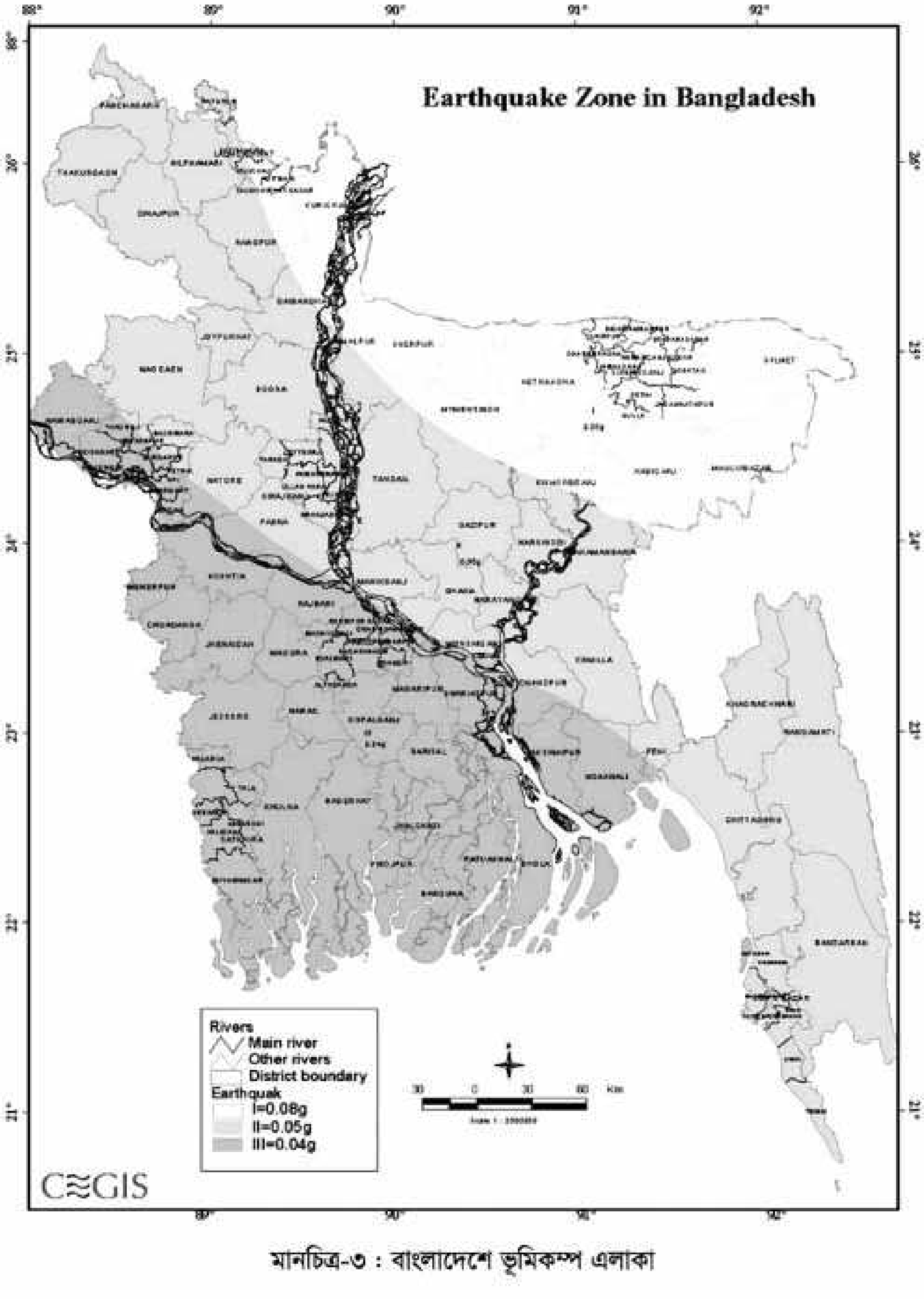

মানচিত্র-৩ : বাংলাদেশে ভূমিকম্প এলাকা

ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বাংলাদেশে রিখটার স্কেলে ৬ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হবে। এর কারণ ঘনবসতি এবং ঝুঁকিপূর্ণভাবে নির্মিত ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা। ঢাকায় আছে ৩.২৬ লাখ ভবন, চট্টগ্রামে ১.৮৫ লাখ এবং সিলেটে ৫২ হাজার ভবন। এর মধ্যে ঢাকার ৯০ হাজার ভবন নরম মাটিতে স্থাপিত এবং আরো ১ লাখ ৩০ হাজার ভবন দুর্বলভাবে নির্মিত, যা ভূমিকম্পের জন্য খুব ঝুঁকিপূর্ণ।

বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশে অনুভূত অতীতের ভূমিকম্পের উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মনে করেন, প্রতি ২০ বছর পরপর ৭ থেকে ৭.৫ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্প হয়।

ভূমিকম্প কী

ভূমিকম্প হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে অনুভূত কম্পন। বেশিরভাগ ভূমিকম্প ছোটখাটো। বড় ভূমিকম্প সাধারণত শুরু হয় অল্প কম্পন দিয়ে, যার মাত্রা দ্রুত বেড়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে এবং শেষ পর্যায়ে আস্তে আস্তে কমে যাওয়া ঝাঁকুনি অনুভূত হয়, যাকে বলা হয় আফটার শক বা পরবর্তী ঘাত।

ভূমিকম্প হচ্ছে একধরনের ঢেউয়ের গতির শক্তি, যা ভূগর্ভস্থ নির্দিষ্ট এলাকায় সৃষ্টি হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর স্থায়িত্ব কয়েক সেকেন্ড থেকে এক দুই মিনিট হতে পারে। ভূগর্ভস্থ যে এলাকায় ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়, তাকে বলা হয় Hypocenter। এটা ভূপৃষ্ঠের ওপর যে এলাকায় সরাসরি অনুভূত হয় তাকে বলা হয় Epicenter। হাইপোসেন্টারে যে শক্তিতে কম্পন হয় তাকে বলা হয় ম্যাগনিটিউড বা তীব্রতা, যা দূরবর্তী স্থানে অনুভূত হয়। এই ক্রমান্বয়ে দূরবর্তী স্থানে অনুভূত শক্তিকে মাত্রা বা intensity বলা হয়। ভূমিকম্প সৃষ্টির পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে পৃথিবীর উপরিভাগে অবস্থিত আটটি প্লেটের নড়াচড়ার ফলে ঘটিত সংঘর্ষ। এই প্লেটগুলো পৃথিবীর CRUST (যার ওপরে শক্ত মাটি থাকে)-এর নিচে গলিত পদার্থ বা লাভার ওপর অবস্থিত।

যেকোনো পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়েছে এই প্লেটগুলোর সংঘর্ষে। অর্থাৎ যেখানে পাহাড় আছে তার নিচে প্লেটগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল ও হবে এবং তাতে ভূমিকম্প হবে।

প্লেটের সংঘর্ষ ছাড়া ভূগঠনের চ্যুতির (Fault) নাড়াচাড়ায়ও ভূমিকম্প ঘটে থাকে। বাংলাদেশে এমন সক্রিয় চ্যুতি আছে, যার কারণে ভূমিকম্প হয়।

বাংলাদেশের কিছু ভূমিকম্প নিচে উল্লেখ করা হলো :

১৫৪৮ : এটি প্রথম রেকর্ডকৃত ভূমিকম্প। এটি ভয়ংকরভাবে চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহকে আঘাত করেছিল।

১৭৬২ : ভয়াবহ এই ভূমিকম্পে চট্টগ্রামের কাছে ১৫৫ কিমি অঞ্চল চিরতরে ডুবে যায়। ঢাকায় ৫০০ জন মারা যায়। তৎকালীন জেনাইল খাল এত চওড়া হয়ে যায় যে এটি পরবর্তীতে যমুনা নদীতে পরিণত হয়। এ ছাড়াও বিপুল ক্ষয়ক্ষতি এবং ভূমিগঠনের পরিবর্তন হয়।

১৮৮৫ : বগুড়ায় ঘটিত ৭ ম্যাগনিচিউড-সম্পন্ন ভূমিকম্পটি যমুনা নদীর চ্যুতির কারণে সৃষ্ট।

১৮৯৭ : শিলং মালভূমিতে সৃষ্ট ভূমিকম্পটি ছিল ৮.৭ মাত্রার। এটি সারা বাংলায় অনুভূত হয় এবং এতে অনেক মৃত্যু না ঘটলেও ব্যাপক অবকাঠামোগত ক্ষতি হয়।

১৯১৮ : শ্রীমঙ্গলে ৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্পটি নিকটবর্তী অঞ্চলে ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়েছিল।

১৯৫০ : আসামের ৮.৪ মাত্রার ভূমিকম্পটি বাংলাদেশে অনুভূত হলেও তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

১৯৯৭ : চট্টগ্রামে ৬ মাত্রার এই ভূমিকম্পে কিছু ছোটখাটো ক্ষতি হয়েছিল।

২০০৩ : ৫.১ মাত্রার এই ভূমিকম্পটি রাঙামাটিতে ঘটেছিল।

২০১১ : ৬.৯ মাত্রার একটি ভূমিকম্প সিকিমে উৎপত্তি হয়েছিল। যদিও এতে বাংলাদেশের তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, কিন্তু এই ভূমিকম্পটি ছিল দুই মিনিট স্থায়ী এবং এটি সারা দেশে অনুভূত হওয়ায় মানুষ চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের অন্যতম ভূমিকম্প উৎপত্তিস্থল ধরা হয় সিলেটের তামাবিল সীমান্তের কাছে ভারতের মেঘালয়ে ডাউকি চ্যুতি বরাবর বিভিন্ন স্থানকে। ভূমিকম্প বোঝার জন্য ১৯৩৫ সালে প্রথম সারা ভারতে একটি সিসমিক জোনিং ম্যাপ তৈরি করা হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের আবহাওয়া বিভাগ একটি ম্যাপ ঠিক করে। ১৯৭৭ সালে একটি বিশেষজ্ঞ দল একটি নতুন জোনিং ম্যাপ তৈরির প্রস্তাব দেয়। এই ম্যাপে বাংলাদেশকে তিনটি সিসমিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগে উত্তর আর পূর্বের অঞ্চলগুলো রাখা হয়েছে, যার ভেতর ডাউকি চ্যুতি অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া সিলেটে রয়েছে সিলেট চ্যুতি। উত্তরবঙ্গে রয়েছে যমুনা চ্যুতি। প্রথমভাগে আরো আছে চট্টগ্রাম ত্রিপুরা ফোল্ডেড বেল্ট—যেখানে প্রায়শই ভূমিকম্প হয়।

দ্বিতীয় অঞ্চল হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যভাগ এবং তৃতীয় অঞ্চল হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, যেখানে ভূমিকম্পের ঝুঁকি রয়েছে।

খ. ভূমিকম্প মোকাবিলার প্রস্তুতি

বাংলাদেশে ভূমিকম্প মোকাবিলার জন্য জরুরিভিত্তিক কার্যক্রম চালানোর জন্য প্রাথমিক কিছু প্রস্তুতি আছে। এটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, সামরিক বাহিনী, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিটি করপোরেশন, স্বাস্থ্য বিভাগ এবং পুলিশসহ বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল, যার কাজ দুর্যোগ-পরবর্তী জীবন বাঁচানো এবং আক্রান্ত অবকাঠামো ও সার্ভিসগুলোকে আবার চালু করা।

এই দলটি কাজ করবে জাতীয় শহর এবং সংস্থা পর্যায়ে। ভূমিকম্প হলে প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়বে সেনা বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, স্বাস্থ্য বিভাগ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস এবং সিটি করপোরেশনগুলো।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ বিভাগ, ওয়াসা, গ্যাস কোম্পানি ও টেলিযোগাযোগ কর্তৃপক্ষ কাজ করবে।

সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচ ধরনের কাজের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব দেওয়া আছে। প্রথম কাজ হচ্ছে জরুরি দায়িত্ব পালন এবং সমন্বয় সাধন, যার নেতৃত্ব দেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো; দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে উদ্ধার ও নিরাপদ স্থানান্তর, যার নেতৃত্ব দেবে ফায়ার সার্ভিস বিভাগ; তৃতীয় কাজ হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা, যা দেবে স্বাস্থ্য বিভাগ; চতুর্থ খাদ্য ও ত্রাণ সরবরাহ—যা করবে ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ এবং শেষের কাজটি সমন্বয় করবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো এবং এর মাধ্যমে নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করা হবে।

এ ধরনের কিছু পরিকল্পনা করা থাকলেও বাস্তবে এর কার্যকারিতা দেখার সুযোগ হয়নি। বলা হয়, আসলে ভূমিকম্পের পর দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশের যথাযথ যন্ত্রপাতিও নেই, দক্ষ লোকবলের অভাবও রয়েছে।

বাংলাদেশের আবহাওয়া বিভাগ ১৯৫৪ সালে চট্টগ্রামে একটি সিসমিক অবজারভেটরি তৈরি করে। এখন পর্যন্ত ছয়টি পর্যবেক্ষণকেন্দ্র আছে। ১৯০০ সাল থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, এ দেশে ১০০টি মৃদু থেকে বড় ভূমিকম্প ঘটেছে। তার মধ্যে ৬৫টি ঘটেছে ১৯৬০ সালের পর। এতে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই অঞ্চলের সিসমিক জোনগুলোতে নতুন করে ভূমিকম্প আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

যেহেতু বাংলাদেশে জাপান কিংবা চীনের মতো ঘন ঘন বড় ভূমিকম্প হয় না, তাই এ দেশে এই দুর্যোগটিকে যথার্থ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের তিন ধরনের করণীয় আছে—ঝুঁকি এড়ানো, উদ্ধার ও পুনর্বাসন এবং প্রস্তুতি। ভূমিকম্প যেহেতু এড়ানো সম্ভব নয়, সেহেতু এর উদ্ধার, পুনর্বাসন এবং প্রস্তুতির ওপর জোর দেওয়া উচিত। এ ধরনের দুর্যোগের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন সুসংগঠিতভাবে অনুসন্ধান-কাজ এবং উদ্ধার করা এবং স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনকাজ করা। তাই প্রয়োজন ভূমিকম্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা।

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় ভূমিকম্প ও সুনামি-ঝুঁকি নিরসনের জন্য আরো কিছু পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ অনুযায়ী ২০১০-১৫ সালের মধ্যে দুর্যোগ-ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে দুর্যোগের ম্যাপ তৈরি করা হবে; সেই সঙ্গে ভূমিকম্পের জন্য প্রস্তুতির উদ্যোগও নেওয়া হবে; কোন কোন এলাকা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তা চিহ্নিত করা হবে; জনগণকে সুনামি ও ভূমিকম্পের বিষয়ে সচেতন করার শিক্ষা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে; শহরের পরিকল্পনা ও উন্নয়নে ভূমিকম্প ঝুঁকির ম্যাপ ব্যবহার করা হবে; বাংলাদেশের জাতীয় বিল্ডিং কোডকে আধুনিকায়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে; পুরোনো দুর্বল স্থাপনাগুলোকে শক্তিশালী করা হবে; ভূমিকম্প-ঝুঁকি নিরাময়ের সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

এসব পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করার মূল দায়িত্বে আছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, সরকার এখনো ১৯৯৩ সালের জাতীয় বিল্ডিং কোডই বাস্তবায়ন করতে পারেনি। সরকার নগর উন্নয়নের জন্য ভালো কিংবা দুর্বল যে পরিকল্পনাই করুক না কেন, ভূমিদস্যু এবং রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের কাছে সরকার সব সময়ই নতজানু আচরণ করে। যে কারণে বাংলাদেশের শহরগুলোতে উচ্চ ঝুঁকি বিদ্যমান।

গ. ভূমিকম্প-সংক্রান্ত রিপোর্টিং

যেহেতু এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়নি, সেহেতু বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে রিপোর্ট সাধারণত জনগণের ভীতি এবং ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

তবে অন্য সব বড় দুর্যোগের মতো ভূমিকম্পের ক্ষেত্রেও একজন রিপোর্টারকে বিশাল ঘটনার জন্যই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে রিপোর্টার নিজেও দুর্যোগে আক্রান্ত হতে পারেন এবং মুহূর্তে যখন সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে যাবে, তখন উপস্থিত বুদ্ধি এবং অন্য মানুষের সাহায্যই হয়ে উঠবে মুখ্য। তার পরও একজন রিপোর্টার তার দায়িত্ব পালন করবেন। তখন প্রাথমিক ফোকাস থাকবে ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতাকে তুলে ধরা; আক্রান্ত ব্যক্তিদের মানসিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটানো, মানবিক আবেদনসম্পন্ন সংবাদ খোঁজা।

- প্রাথমিক রিপোর্টগুলো অন্যান্য দুর্যোগের রিপোর্টগুলোর মতোই তৈরি হবে। তবে বড় ভূমিকম্পের ফলে বিল্ডিং ধসে পড়তে পারে, আগুন লেগে যেতে পারে এবং বিদ্যুৎ ও পানির অভাব হবে, সে আশঙ্কা থাকবেই। শহরে এ ধরনের দুর্যোগের তাণ্ডব হতে পারে অভাবনীয়। রিপোর্টের ফোকাস তখন সেদিকেই হবে।

- পরবর্তী সময়ে রিপোর্টারকে নজর দিতে হবে উদ্ধারকাজের গতি ও কার্যকারিতার ওপর। সরকার দুর্যোগটি কত গুরুত্ব দিয়ে ব্যবস্থাপনার চেষ্টা করছে এবং বেসরকারি বা অন্যান্য সংস্থাগুলো কী করছে তাও দেখা।
- পুনর্বাসন পরিকল্পনা যথার্থ হচ্ছে কি না। এর দুর্বলতা কী। জনগণ কী চায়। আক্রান্ত জনপদের প্রয়োজনীয়তা মিটছে কি না—এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা উচিত।
- ভূমিকম্পটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষের বোঝার মতো করে লেখা উচিত।
- ভূমিকম্পের প্রস্তুতি কেমন ছিল। সরকার ও বিশেষজ্ঞরা সন্তুষ্ট কি না। কেন সন্তুষ্ট নন। কোথায় দুর্বলতা ছিল তা অনুসন্ধান করা।
- সিটি করপোরেশনসহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দুর্যোগের সময় কী ভূমিকা পালন করেছে তা লক্ষ করা।
- ভূমিকম্পের ফলে কোনো ভূগঠনের পরিবর্তন ঘটেছে কি না। এই পরিবর্তন কী ধরনের এবং তা জীবনকে আক্রান্ত করবে কি না তা খতিয়ে দেখা।

এ ছাড়া ঝুঁকি নিরসনমূলক কিছু বিশেষ রিপোর্ট করা যায়। যেমন—

- গণসচেতনতামূলক রিপোর্ট এ ধরনের রিপোর্টে মানুষকে জানানো উচিত, ভূমিকম্পের সময় কী কী করলে তারা কিছুটা নিরাপদ থাকতে পারে। তবে এসব রিপোর্টের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রয়োজন। যেমন, একটি ছোট ভূমিকম্পের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ ধরনের রিপোর্ট করা যেতে পারে।
- অপরিকল্পিত নগরায়ণের ঝুঁকি নিয়ে বিশেষ রিপোর্ট হতে পারে। এতে বিল্ডিং কোড কেন অনুসৃত হচ্ছে না, এই বিষয়টি ফোকাসে আনা যায়।
- যেকোনো নতুন বড় স্থাপনায় ভূমিকম্প-ঝুঁকি নিরসনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি না, তা দেখা।
- নতুন নগর পরিকল্পনায় ভূমিকম্প-ঝুঁকির বিষয়টি নিরীক্ষা করা যায়।
- সরকারের পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন নিয়ে নিরীক্ষা। এ বিষয়ে সরকার কতটুকু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাস্তবায়ন নিয়ে কোনো অনিয়ম আছে কি না তা খুঁজে দেখা।
- ভূমিকম্প-ঝুঁকি নিরসনের জন্য কর্তৃপক্ষের কর্মক্ষমতা আছে কি না। থাকলে কত দূর। কী কী ধরনের প্রস্তুতি নেই তা উল্লেখ করা।
- জরুরি উদ্ধারকাজের প্রস্তুতিতে কতটুকু ঘাটতি আছে। সরকার এ বিষয়ে কী ভাবছে।
- জরুরি স্বাস্থ্যসেবার অবস্থা সন্তোষজনক কি না।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশের অন্যান্য দুর্যোগ

ক. লবণাক্ততা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে নীরবে যে দুর্যোগটি প্রতিবছর ঘনীভূত হচ্ছে, তা হলো সমুদ্র থেকে ক্রমশ দেশের ভেতর দিকে এগিয়ে আসা লবণাক্ততা। এই লবণাক্ততা এক দিকে কৃষিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, অন্যদিকে এতে করে একদিকে যেমন খাওয়ার পানির উৎস নষ্ট করছে আরেক দিকে খাওয়ার পানির অভাব সৃষ্টি করছে। এতে বিভিন্ন জনপদ অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগতভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা এই দুর্যোগের জন্য দায়ী করেন জলবায়ু পরিবর্তনকে। তবে সেই সঙ্গে দায়ী করা হয় অপরিকল্পিতভাবে যত্রতত্র সামুদ্রিক চিংড়ি চাষ এবং ত্রুটিপূর্ণ বাঁধ নির্মাণকে।

বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ (BCAS) সরকার ও দাতাদের সহায়তায় গবেষণা করে দেখেছে যে, বিগত কয়েক বছর উপকূলবর্তী এলাকায় বিপজ্জনক হারে লবণাক্ততা বেড়ে গেছে। ১৯৭৩ সালে ৭.৫ লাখ হেক্টর জমি লবণাক্ততায় আক্রান্ত ছিল। তা ২০০৯-এ বেড়ে ৯.৫ লাখ হেক্টরে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই গবেষণায় দেখা গেছে যে বাগেরহাটের শরণখোলা, খুলনার ডুমুরিয়া এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় লবণাক্ততা বেড়েছে দ্বিগুণ।

এতে আরো দেখা গেছে, বিষখালী, আন্ধারমানিক ও পায়রা নদে গত এক যুগে বিপজ্জনকভাবে লবণাক্ততা বেড়েছে। পাশাপাশি পিরোজপুর ও ভোলার ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে লবণাক্ততা ৫ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ বেড়েছে ২০০৫ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে।

গত তিন যুগে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠ ৪১ সেন্টিমিটার বেড়েছে। এর ফলে ৯.৩০ লাখ হেক্টর জমি সামুদ্রিক পানিতে প্লাবিত হয়েছে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ আরো ২.১৫ লাখ হেক্টর জমি প্লাবিত হতে পারে।

লবণাক্ততার ফলে এসব উপকূলবর্তী জমির উর্বরতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। এর ফলে গাছপালা পুষ্টি পাচ্ছে না, ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশের মোট ভূমির ৩০ শতাংশ জমি উপকূলবর্তী এলাকায় অবস্থিত এবং এর পুরোটাই লবণাক্ততার হুমকির সম্মুখীন।

স্থলভাগে লবণাক্ততার তীব্রতা বাড়ে শীতকালে। বর্ষাকালে যেখানে লবণাক্ততা আক্রান্তের হার শতকরা ১০ ভাগ, শীতকালে তা দাঁড়ায় ৪০ ভাগে।

বিজ্ঞানীরা বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে নদীর নিয়মিত পানিপ্রবাহ সমুদ্রের লবণাক্ততা দ্বারা স্থলভাগকে আক্রান্ত করতে দেয় না। কিন্তু বিগত কয়েক যুগ ধরে নদীগুলোর পানিপ্রবাহ বিভিন্ন কারণে কমে গেছে, বিশেষত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদীগুলোতে। এর ফলে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা ও বরিশালসহ বিভিন্ন জেলা লবণাক্ততায়

আক্রান্ত হয়েছে। লবণাক্ততার ফলে এসব অঞ্চলের মানুষের ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে। ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া এবং ডায়রিয়ার প্রকোপ বাড়ছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, লবণাক্ততার জন্য দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ইতিমধ্যেই দুর্গত এলাকা হয়ে গেছে, যা ভবিষ্যতে আরো ভয়াবহ রূপ নেবে।

লবণাক্ততা নিয়ে কী ধরনের রিপোর্ট হতে পারে

১. স্পট রিপোর্টিং : রিপোর্টার সরজমিনে আক্রান্ত অঞ্চল ঘুরে এসে রিপোর্ট করতে পারেন, যেখানে মানুষের আর্থসামাজিক ও স্বাস্থ্যগত দুর্ভোগের চিত্র আসবে। সেই সঙ্গে আসবে সেখানে আদৌ কোনো পুনর্বাসন ও উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে কি না, সে বিষয়টি।

২. লবণাক্ততা মোকাবিলা করার জন্য সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে। এগুলো বাস্তবসম্মত কি না। বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না। না হওয়ায় মানুষ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৩. চিংড়ি চাষে আসলেই কি দেশ লাভবান হচ্ছে? কৃষিজমি নষ্ট হয়ে যাওয়ার অর্থনৈতিক ক্ষতি কত। খাওয়ার পানির উৎস কিংবা একটি এলাকার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ক্ষতি কত। চিংড়ি রপ্তানি করে কত আয় হচ্ছে।

৪. আক্রান্ত অঞ্চলগুলোর নদীর অবস্থা কী। যদি শুকিয়ে কিংবা সংকীর্ণ হয়ে থাকে-তাহলে কেন এমন হলো।

৫. সুন্দরবন এই লবণাক্ততা দিয়ে কীভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। এর জীববৈচিত্র্যের ভবিষ্যৎ কী। এখানে লবণাক্ততার প্রভাব কমানোর জন্য কোনো উদ্যোগ আছে কি না।

খ. আর্সেনিক

আর্সেনিক হচ্ছে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক একধরনের কেমিক্যাল। এর কোনো রং, গন্ধ ও স্বাদ নেই। সেজন্য এটি যদি খাদ্য কিংবা পানির সঙ্গে আমরা গ্রহণ করি, তাহলে বুঝতে পারব না যে আমরা বিষ গ্রহণ করছি। আর সেটা বোঝা আরো দুরূহ হয়ে ওঠে, যদি এই আর্সেনিক প্রাকৃতিকভাবেই ভূগর্ভস্থ পানির আধারকে বিষাক্ত করে রাখে। বাংলাদেশে ব্যাপক এলাকা জুড়ে এভাবেই আর্সেনিক ভূগর্ভস্থ পানির উৎসকে বিষাক্ত করে রেখেছিল, যা নব্বই দশকের আগে আমরা বুঝতে পারিনি।

বাংলাদেশে সনাতনভাবে মানুষ পুকুর, কুয়া কিংবা নদীর পানি ব্যবহার করে আসছে। সত্তরের দশকে এ দেশে ব্যাপকভাবে নলকূপের পানি ব্যবহার করায় প্রচলন ঘটে। যেহেতু নলকূপের পানি দেখতে পরিষ্কার, সেহেতু নিরাপদ খাওয়ার পানি হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

আশির দশকের শেষ দিক থেকে প্রথম দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চিকিৎসকেরা দেখতে পেলেন, একই অঞ্চলের কিছু রোগী একই ধরনের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসা নিতে আসছে। পরবর্তী সময়ে কয়েক বছর বিষয়টি অনুসন্ধান করে আবিষ্কার হলো যে ঐসব অঞ্চলের নলকূপে বিপজ্জনক মাত্রায় আর্সেনিক আছে।

এরপর ব্যাপক গবেষণা করে যে চিত্র ফুটে উঠল তা ভয়াবহ। আমাদের দেশের বেশিরভাগ এলাকার টিউবওয়েলের পানি আর্সেনিক দ্বারা আক্রান্ত।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, প্রতি লিটার পানিতে ০.০৫ মিলিগ্রামের বেশি আর্সেনিক থাকলে তা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। যেহেতু এটি ব্যাপকভাবে সারা দেশের নলকূপের পানিতে কম-বেশি বিদ্যমান, তাই বহু মানুষ এর বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে জীবন কাটাচ্ছে। কেউ কেউ মারা যাচ্ছে। বিশ্বের অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে বাংলাদেশের জনগণ এর ঝুঁকি অনেক বেশি বহন করছে।

মানুষের দেহে আর্সেনিকের প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যায় না। এর লক্ষণ ছয় মাস থেকে ২০ বছর কিংবা এরও বেশি সময় পর দেখা যেতে পারে। এটা নির্ভর করে মানুষের রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতার ওপর।

সরকারি ও বেসরকারি অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৯টি জেলার অনেক নলকূপের পানিতে আর্সেনিক-দূষণ আছে। কিছু কিছু নলকূপে আবার এই দূষণ নেই। যেসব এলাকায় এখনো দূষণ পাওয়া যায়নি, তা হচ্ছে শেরপুর, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান।

একজন মানুষ আর্সেনিক আক্রান্ত কি না, তা তার চুল, নখ ও চামড়া পরীক্ষা করলে বোঝা যায়। প্রথম পর্যায়ে আক্রান্ত ব্যক্তির গায়ে কালো দাগ দেখা যায়; হাত ও পায়ের তালু শক্ত খসখসে হয়ে যায় এবং ছোট ছোট শক্ত গুটি দেখা যেতে পারে; গায়ের চামড়া মোটা ও খসখসে হয়ে যায়; বমি বমি ভাব ও অরুচিসহ বিভিন্ন উপসর্গ দেখা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে আক্রান্ত ব্যক্তির চামড়ার বিভিন্ন জায়গায় সাদা, কালো বা লাল দেখা যায়; হাত-পা ফুলে ওঠে এবং তৃতীয় পর্যায়ে কিডনি, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস বড় হয়ে ওঠে এবং টিউমার হয়। হাত-পায়ে ঘা হয়, পচন ধরে, চামড়া, মূত্রথলি ও ফুসফুসে ক্যানসার হয়; কিডনি-লিভার অকেজো হয়ে পড়ে।

ক্রনিক আর্সেনিকোসিস (আর্সেনিক-সৃষ্ট অসুখ) কোনো চিকিৎসা দিয়ে সারানো যায় না। এর চিকিৎসা হচ্ছে শরীরে নতুন করে যেন আর্সেনিক ঢুকতে না পারে। এজন্য গণসচেতনতা এবং নিরাপদ পানির উৎস নিশ্চিত করা জরুরি।

আর্সেনিক-সমস্যাটি মোটামুটি দেশব্যাপী হওয়ায় এ থেকে নিরাময়ের জন্য সরকারি-বেসরকারি এবং ইউনিসেফের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন টিউবওয়েলের পানি পরীক্ষা করে দূষণযুক্ত টিউবওয়েলগুলো লাল রং দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে; আর যেগুলো দূষণমুক্ত, সবুজ রং দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ৮৬ লাখ নলকূপ রয়েছে; এর মধ্যে ৪৭ লাখ পরীক্ষা করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৩ লাখকে সবুজ রং অথবা নিরাপদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের ৫৪ হাজার ৪১টি গ্রামে টিউবওয়েল চিহ্নিতকরণ হয়েছে।

বর্তমানে আর্সেনিক নিয়ে গণসচেতনতা কার্যক্রম চালাচ্ছে সরকার ও কিছু এনজিও। ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ আর্সেনিকযুক্ত পানি পানের ঝুঁকি সম্পর্কে জ্ঞাত এবং তারা অন্যান্য উৎস থেকে নিরাপদ পানি গ্রহণের জন্য উদ্যোগী।

আর্সেনিক নিয়ে কী ধরনের রিপোর্ট হতে পারে

১. যেসব এলাকা আর্সেনিক-দূষণ প্রবল, সেসব এলাকায় মানুষ কীভাবে আছে; সেখানে স্বাস্থ্যসেবার অবস্থা কী; আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকার উৎপাদনশীলতা কমে গেছে কি না—এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রিপোর্ট হতে পারে।

২. প্রকৃতপক্ষে মানুষ আর্সেনিক-ঝুঁকি নিয়ে কতটুকু সচেতন হয়েছে। তারা আসলেই নিরাপদ উৎস থেকে পানি নেয় কি না। ঝুঁকি জেনেও দূষিত পানি ব্যবহার করে কি না।

৩. আর্সেনিক-দূষণ মোকাবিলায় সরকার বর্তমানে কী করছে। এ বিষয়ে নীতি কী। বাজেট কত।

৪. ফসলে সেচের কাজেও আর্সেনিকযুক্ত পানি ব্যবহৃত হয়। এতে স্বাস্থ্যঝুঁকি কতটুকু আছে। বিশেষজ্ঞরা কী বলেন।

কপোতাক্ষ

কপোতাক্ষ-পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে এমন দিন বেশি দূরে নয়, যখন কপোতাক্ষ নদ চিরতরে হারিয়ে যাবে। শুধু মানুষের স্মৃতিচারণাতেই স্থান হবে তার। এমন আশঙ্কায় কপোতাক্ষ তীরের মানুষ নদীটিকে রক্ষার আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে তারা নানাভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালিয়েও হতাশ হয়েছেন। কপোতাক্ষের নাব্যতা হারিয়ে যাওয়ায় যশোর, সাতক্ষীরার প্রায় ৩০ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে ড্রেজিং শুরু হলেও তাতে কোনো উন্নতি হয়নি। বরং ড্রেজিং করে নদীর মাঝখানেই মাটি স্তূপ করে রাখা হয়েছে। এতে করে একটি নদী সরু তিনটি খালে পরিণত হয়েছে। এ সুযোগে নদীর জমি বেদখল হয়ে যাচ্ছে।

কপোতাক্ষে নাব্যতা না থাকায় বর্ষা মৌসুমে বিলে পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। পানি বের হওয়ার পথ না থাকায় বিলের উপচে পড়া পানি বাড়িঘরে ঢুকে পড়ছে। গত কয়েক বছর ধরে কেশবপুর ও সাতক্ষীরার তালা এলাকার মানুষ রাস্তার পাশে বাঁধ করে থাকছে। তাদের জন্য তেমন সাহায্য-সহযোগিতাও করছে না সরকার।

অন্যদিকে কপোতাক্ষে নাব্যতা-সঙ্কটের কারণে প্রতিবছর নদের অববাহিকার পাঁচ জেলার অন্তত ৩০ লাখ মানুষ জলাবদ্ধতার শিকার হয়েছে। প্রতিবছরই তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। লোন পানির কারণে চাষাবাদ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বন্ধ হয়ে গেছে। পানির দামে লবণাক্ত জমি বেচে উদ্বাস্তু হচ্ছে সাধারণ কৃষক।

সমস্যার সমাধানে উৎসমুখে ভরাট হয়ে যাওয়া নদী খনন করতে হবে। অথচ সরকার ভাটিতে নদী খননের জন্য ২৬১ কোটি ৫৫ লাখ টাকা বরাদ্দ করায় মানুষ বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলেছে। ভুল প্রকল্পে কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। রাজনৈতিক সুবিধাভোগী ও সংশ্লিষ্টদের পেটই আরো মোটা হয়েছে।

সর্বশেষ গত ৩০ নভেম্বর ২০১১ কপোতাক্ষ বাঁচাও আন্দোলন ঝিকরগাছা থেকে যশোর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ পদযাত্রা করেছে। ভুল পরিকল্পনা

বাতিল করে জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধান, উজানে পদ্মা ও মাথাভাঙ্গা নদীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, তলদেশ খননসহ বিভিন্ন দাবিতে গর্জে উঠেছে মৃতপ্রায় কপোতাক্ষপারের মানুষ।

আন্দোলনের নেতা অনিল বিশ্বাসের মতে, গত বছর মাত্র ৬০ কিলোমিটার খনন করলেই নদটিকে বাঁচানো যেত। অথচ এখন খনন করতে হবে প্রায় ৯০ কিলোমিটার। আর যদি খনন প্রক্রিয়া মে-জুন নাগাদ গিয়ে শুরু হয়, তখন ১৩০ কিলোমিটারেরও বেশি খনন করতে হবে।

মাথাভাঙ্গা থেকে জন্ম নেওয়া প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ কপোতাক্ষ নদ বঙ্গোপসাগরে পড়েছে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে। কপোতাক্ষ-ভৈরবের মতো নদ-নদীর মিঠা পানির সঙ্গে সাগরের লোনা পানির দিবারাত্রির খেলার কারণেই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল হিসেবে সুন্দরবনের জন্ম হয়েছে। এখন মিঠা পানির অভাবে লোনা পানিতে আক্রান্ত হয়ে আগামরা রোগ ছড়িয়ে পড়ছে সুন্দরবনের গাছ-গাছালিতে। তাই সুন্দরবন বাঁচাতে মিঠা পানির উৎস নদ-নদীগুলোকে বাঁচানোর বিকল্প নেই। কিন্তু সরকার সুন্দরবনকে নিয়ে যতটা মাতামাতি করে, এসব নদ-নদী নিয়ে চিন্তা তার ধারেকাছেও করে বলে মনে হয় না। নইলে কপোতাক্ষের আজকের মুমূর্ষু অবস্থা সৃষ্টি হতো না।

উজানে পদ্মা-মাথাভাঙ্গার সঙ্গে ভৈরব-কপোতাক্ষের সংযোগ না করে বিগত দিনের মতো এ সরকারের আমলেও শুধু পানি অপসারণের নামে এর মধ্যেই ২৬ কোটি টাকার প্রকল্প কোনো কাজে আসেনি। বিস্তীর্ণ এলাকায় জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধানের জন্য নদীর তলদেশ খননই যথেষ্ট নয়, স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করাও জরুরি।

সৌজন্যে : দৈনিক গ্রামের কাগজ, যশোর

গ. জলাবদ্ধতা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল লবণাক্ততা, আর্সেনিক দূষণসহ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন দুর্যোগে আক্রান্ত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে দীর্ঘমেয়াদি জলাবদ্ধতাজনিত দুর্যোগ।

এই অঞ্চলটিকে বলা হয় জলবায়ু পরিবর্তনে পৃথিবীতে একটি অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সমুদ্রপৃষ্ঠ ধীরে ধীরে উঁচু হতে থাকলে এই অঞ্চলে জলাবদ্ধতা

আরো বেড়ে যাবে। তবে ইতোমধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এটি কেবল জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নয়, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরকারের ভ্রান্ত পানি নীতি, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব ও বন্যা।

১৯৬০-এর দশকে সরকার একটি উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছিল। এর লক্ষ্য ছিল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি। কিন্তু এই কাজটি করতে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ঐ অঞ্চলের প্রতিবেশ পরিবর্তন হয়ে যায়। ঐ প্রকল্পটি ছাড়াও সরকারের বেশ কিছু বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পও পরিবেশকে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে পরিবর্তন করে ফেলে। এর ফলে ঐ অঞ্চলের জলাভূমিগুলো শুকনো চাষাবাদযোগ্য ভূমিতে পরিণত হয়। সেখানে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ শুরু হয়। এসবের ফলে ঐসব জলাভূমি নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে; পলিমাটি নিয়মিত জমা হওয়ার প্রক্রিয়াটি থেমে যায় এবং নদীগুলোর তলা ধীরে ধীরে ভরাট হতে থাকে। আর তা কোনো কোনো অঞ্চলে এত বেশি পরিমাণে হয় যে নদীর তলদেশ ঐ সব জলাভূমি থেকে বেশি উঁচু হয়ে যায়। এর ফলে জলাবদ্ধতায় আক্রান্ত হয় ঐ সব এলাকা।

ষাটের দশকের পর আশি ও নব্বইয়ের দশকেও সরকার একই ধরনের অবকাঠামো গঠনের প্রকল্প হাতে নেয়, যেমন খুলনা-যশোর নিষ্কাশন প্রতিস্থাপন প্রকল্প। এসব প্রকল্পের ফলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হয়ে গেছে।

এই মানুষসৃষ্ট দুর্যোগের সঙ্গে সমুদ্রপৃষ্ঠ বৃদ্ধি নিয়ে এসেছে আরো বড় সমস্যা। বিজ্ঞানীরা মনে করেন গত ৩০ বছরে প্রতিবছর সমুদ্রপৃষ্ঠ বেড়েছে তিন-চার মিলিমিটার হারে। এর ফলে সমুদ্রে পানি যাচ্ছে কম। আবার বর্ষার সময় একটানা বৃষ্টিতে ঐ সব এলাকায় ব্যাপক বন্যা হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ বেড়ে যাওয়ায় ঐ পানি সহজে নামতে চায় না। তাই প্রতিবছর ১ লাখ ৪৪ হাজার ৫২১ হেক্টর জমি প্রায় আট মাস জলাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। এ ছাড়া প্রতিবছর নতুন করে আরো ১০-১২ হাজার হেক্টর জমি জলাবদ্ধ হচ্ছে। অর্থাৎ সমস্যাটি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

সাতক্ষীরা, খুলনা ও যশোরে ২০১১ সালের জুলাই-আগস্টের বৃষ্টিতে যে বন্যা হয় তা অক্টোবর মাসেও বিদ্যমান ছিল। এতে লাখ লাখ লোক দীর্ঘ সময় ধরে দুর্গতির শিকার হয়েছে।

এ ধরনের দুর্যোগে ঐ সব অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এত ব্যাহত হচ্ছে যে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়ভাবে ক্রমশই খারাপ থেকে খারাপতর হচ্ছে। সেই সঙ্গে এসব এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া বা এমনকি খাওয়ার পানি পাওয়াও দুরূহ হয়ে উঠেছে। এখানে ৮৫ শতাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আবার ৬৬ শতাংশ মানুষ হচ্ছে ভূমিহীন কৃষক। কিন্তু কৃষি ব্যাহত হওয়ায় এদের অধিকাংশ সময়ই হাতে কোনো কাজ থাকে না।

জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার ফলে এসব অঞ্চলে খাদ্যের অভাব প্রতিবছর বাড়ছে। ত্রুটিপূর্ণ বাঁধ এবং চিংড়ি চাষের জন্য ব্যবহৃত লোনা পানি এই অঞ্চলে দুর্যোগ সৃষ্টি করলেও এ সমস্যা সমাধানে সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই। এখানে ফসলের বৈচিত্র্যও নেই বলে অতিদরিদ্র মানুষ অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে জীবিকা নির্বাহ করছে।

বিভিন্ন হিসেবে দেখা যায়, প্রায় ৯.২ লাখ মানুষ জলাবদ্ধতার শিকার। এরা বছরে কমপক্ষে তিন মাস জলাবদ্ধতায় আক্রান্ত হয়; কোনো কোনো এলাকায় আট মাস পর্যন্ত জলাবদ্ধতা বিদ্যমান।

জলাবদ্ধতা নিয়ে কী ধরনের রিপোর্ট হতে পারে

ক. সরকার জলাবদ্ধ জনপদ উন্নয়নে কী পদক্ষেপ নিয়েছে। না নিয়ে থাকলে নেয়নি কেন।

খ. জলাবদ্ধতার ফলে আক্রান্ত এলাকায় মানুষ কী রকম দুর্গতির শিকার। তাদের জীবন ধারণ করতে কী কী করতে হয়। আক্রান্ত জনপদের নিজস্ব উদ্যোগ আছে কি না। না থাকলে কেন নেই।

গ. সরকারের পানি নীতি পর্যালোচনা এবং ঐ অঞ্চলে তৈরি বাঁধগুলোর উদ্দেশ্য ও তার প্রভাব পর্যালোচনা।

ঘ. দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ত্রুটিপূর্ণ বাঁধগুলোয় পরিবর্তন আনা যাচ্ছে না কেন।

ঙ. আক্রান্ত অঞ্চলের মানুষদের ভবিষ্যৎ কী। সেখানে মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিশ্চিত না হলে অদূর ভবিষ্যতে কী হতে পারে।

ঘ. ভূমিধস

বাংলাদেশে ভূমিধস দুর্যোগটি মূলত এর দক্ষিণ অঞ্চলে ঘটে থাকে। প্রাকৃতিকভাবে ভূমিধস ঘটে যখন উঁচু মাটিতে বৃষ্টি কিংবা বিপুল পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয়ে মাটিকে ফুলিয়ে খুব নরম করে ফেলে। এ ধরনের ঘটনা বর্ষাকালে পাহাড়ি অঞ্চলে ঘটে থাকে।

বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে ভূমিধস সব সময়ই ঘটে আসছে। কিন্তু এসব ভূমিধস সচরাচর সংবাদ হয়ে আসে না। কারণ অধিকাংশ পাহাড়ি এলাকায় জনসংখ্যার চাপ

কম। যেসব ভূমিধস সংবাদ হয়ে ওঠে, সেগুলো হয় চট্টগ্রাম না হয় রাঙ্গামাটি শহরে সংঘটিত ভূমিধস। বিশেষ করে, চট্টগ্রামের ভূমিধসের সংবাদ প্রতিবছর বৃষ্টির মৌসুমে সংবাদমাধ্যমে আসবেই। কারণ, এতে বিপুল পরিমাণ মানুষ মারা যায়। যেমন, ২০০৭ সালে একটি ধসে চট্টগ্রামে ১২০ জন মারা গিয়েছিল। চট্টগ্রাম শহরে এই ধরনের দুর্যোগে প্রাণনাশ বেশি হওয়ার কারণ পাহাড় ঘেঁষে গড়ে ওঠা ঘনবসতি বস্তি ও নিম্নবিত্তের মানুষের বসতি। অন্যদিকে দুর্বৃত্তের দল প্রায়শই পাহাড়ের মাটি কেটে বিক্রি করছে কিংবা উচ্চাভিলাষী ডেভেলপাররা অবৈজ্ঞানিকভাবে পাহাড় কেটে বাড়িঘর নির্মাণ করছে। এভাবে পাহাড় কাটায় পাহাড়ের মাটি ধসে পড়ার আশঙ্কা অনেক বেড়ে যায়।

রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় ভূমিধস প্রায়শই বর্ষাকালে ঘটে থাকে। এখানে ভূমিধসে প্রতিবছরই কিছু সময় যোগাযোগ ব্যাহত হয়। পাহাড়ে ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ এবং জুম পদ্ধতিতে চাষাবাদ এ ধরনের ধস আরো বাড়িয়ে তুলছে।

বাংলাদেশের ১৮ শতাংশ ভূমি নিয়ে আছে পাহাড়ি অঞ্চল। এখানে আছে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ। ভূমিধসের কারণে এসব এলাকায় উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা ভূমিধসের কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চিহ্নিত করেছেন :

১. মাটির পার্শ্ববর্তী চাপ বা সাপোর্ট সরিয়ে ফেলা, যা পাহাড় কাটার ফলে হতে পারে কিংবা নদীভাঙনের প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট অবস্থা; মানুষ-সৃষ্ট বড় গর্তের কারণে হতে পারে।

২. ঢালের ওপর ওজন বাড়িয়ে তোলা, যা হতে পারে বৃষ্টির কারণে কিংবা ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা তৈরির কারণে।

৩. ভূমিকম্পের কারণে হতে পারে।

৪. প্রাকৃতিকভাবে একটি এলাকা ঢালু হয়ে যেতে পারে। ভূতাত্ত্বিক গঠনের পরিবর্তনের কারণে হতে পারে।

৫. উঁচু স্থানের নিম্নবর্তী চাপ বা সাপোর্ট সরিয়ে ফেললেও এটা ঘটতে পারে। নিম্নবর্তী চাপ সরানোর কাজটা নদী ও ঢেউয়ের কারণে হতে পারে। কাদা ফেঁপে উঠে হতে পারে।

৬. জুম চাষের ফলে পরিবর্তিত ভূমি গঠনের কারণে ঘটতে পারে।

ভূমিধসের ঝুঁকি কমানোর জন্য বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় প্রকৌশলগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যেমন, উপরিভাগে এবং নিচে নিষ্কাশন-ব্যবস্থা নির্মাণ; অস্থিতিশীল ঢাল সরিয়ে ফেলা; দেয়াল নির্মাণ ইত্যাদি। বান্দরবানে আরেক ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি

পাহাড়ের ওপর নির্মিত ভূমি সংরক্ষণ এবং পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রটি নিশ্চিত ভূমিধস থেকে ১৯৯৫ সালে রক্ষা করা হয়েছে। এখানে বিজ্ঞানীরা পাহাড়ের দুর্বল এলাকাগুলোতে বিভিন্ন জাতের গাছের বীজ ছিটিয়ে Geo jute কাপড় দিয়ে তা ঢেকে দেয়। তার ওপর বাঁশের খুঁটি দিয়ে এমনভাবে আটকে দেয় যাতে ঐসব দুর্বল স্থান দিয়ে বৃষ্টির পানি প্রবাহিত না হয়।

ভূমিধস নিয়ে কী ধরনের রিপোর্ট হতে পারে

১. পাহাড়ি শহরগুলোতে ভূমিধসের ঝুঁকির মধ্যে কীভাবে জনপদ গড়ে উঠেছে। তারা সচেতনভাবে আছে কি না। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কী করছে।

২. ভূমিধসের কারণ জেনেও সরকার তা নিরাময় করার পদক্ষেপ নিচ্ছে না কেন? এ বিষয়ে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ, যেমন—মেয়র কিংবা জেলা প্রশাসক কী ব্যাখ্যা দিচ্ছে।

৩. ভূমিধসের কারণে কীভাবে উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

৬. খরা

খরা হচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে অনাবৃষ্টি কিংবা অপ্রতুল বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট অস্বাভাবিক শুষ্ক একটি পরিবেশ। খরার ফলে মাটি শুকিয়ে ফেটে যায়। ভূগর্ভস্থ পানির আধারে পানি কমে যায়, যার ফলে পানির অভাব ঘটে। এতে কুয়া কিংবা নলকূপেও পানির ঘাটতি দেখা যায়। শস্য নষ্ট হয়ে যায়। গবাদিপশুর খাদ্যাভাব ও মৃত্যু ঘটে। খরা একটি বিশাল দুর্যোগ। সভ্যতার প্রারম্ভ থেকে মানুষ বিভিন্ন সময় খরার মুখোমুখি হয়েছে। অনেক স্থানে সভ্যতা খরার কারণে শেষ হয়ে গেছে। বিশাল এলাকা জুড়ে খরার ফলে ধূলিঝড় ও আগুনে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গত শতাব্দীতে এই উপমহাদেশের সবচেয়ে খারাপ খরাটি হয়েছিল ভারতের ১২টি প্রদেশে ১৯৯৯-২০০০সালে।

বাংলাদেশে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খরা একটি প্রতিনিয়ত ব্যাপার। কোনো কোনো খরার ফলে দুর্ভিক্ষও হয়েছে। খরার শুরুটা বোঝা যায় বাঁশঝাড় ও সুপারি গাছের ওপরটা যখন পোড়া পোড়া দেখায়। এসব গাছের ওপর দিকে নতুন পাতা পানির অভাবে মরে যেতে থাকে। যদি দীর্ঘ সময় এসব এলাকায় বৃষ্টি এবং আর্দ্রতার অভাব হয়, তাহলে এসব গাছ মরে যাবে।

যেসব স্থানে সচরাচর প্রচুর বৃষ্টি হয় সেসব স্থানেও খরা হতে পারে। খরা যদি তীব্র হয়, ফসলের ২০ থেকে ৬০ ভাগ ক্ষতি হতে পারে। তীব্রতর খরায় আরো খারাপ অবস্থা হতে পারে। এসব ক্ষতি কমানোর জন্য আধুনিক সেচব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং নওগাঁয় ইদানীং প্রতিবছরই খরা হয়ে থাকে। এই জেলাগুলো বাংলাদেশের প্রাচীন বরেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত। বরেন্দ্রভূমিতে তুলনামূলক কম বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু এটি ইদানীং ক্রমশই আরো কম ঘটছে। যেমন ১৯৮১ সালে বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টি হয়েছিল ১ হাজার ৭৩৮ মিলিমিটার। ১৯৯২ সালে তা কমে ৭৯৮ মিলিমিটার হয়েছে।

আবার গরমকালে বরেন্দ্রভূমিতে তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩৫ ডিগ্রি কিংবা তার বেশি থাকে। আবার শীতকালে বেশ তীব্র শীত থাকে। গরমে যেমন কখনো কখনো তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি পর্যন্ত বেড়ে যায়, তেমন শীতে ৫ ডিগ্রির নিচে নেমে যাওয়া এখানে স্বাভাবিক ঘটনা। এই অঞ্চলের আবহাওয়া দেশের অন্য সব অঞ্চল থেকে ভিন্ন।

আবহাওয়াবিদেরা খরাকে তিন ভাগে ব্যাখ্যা করেন। একটি হচ্ছে সব সময়ের খরা, যা শুষ্ক জলবায়ু দ্বারা সৃষ্ট; মৌসুমি খরা, যা বর্ষা ও শীতকালের অনিয়মের জন্য সৃষ্ট এবং হঠাৎ খরা, যা অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে হয়। বাংলাদেশে শেষের দুই ধরনের খরা বিদ্যমান। খরা সাধারণত মৌসুমি আবহাওয়ার আগে ও পরে ঘটে। গত ৫০ বছরে বাংলাদেশে ২০টির মতো খরা হয়েছে। আর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে নিয়মিত খরার জন্য খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত যে খরা হয়েছিল, তাতে দেশের ৪৭ শতাংশ জমি আক্রান্ত হয়েছিল এবং দেশের ৫৩ শতাংশ মানুষ তাতে দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। এই খরাটি ছিল গত শতাব্দীর সবচেয়ে খারাপ খরা।

এসব খরার জন্য প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও কিছু রাজনৈতিক কারণ আছে। বাংলাদেশকে ভারতের সঙ্গে ৫৫টি এবং মিয়ানমারের সঙ্গে তিনটি নদী ভাগ করে। এসব নদীগুলোর বেশিরভাগই উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। এসব নদীর পানিপ্রবাহ উপরিভাগে, অর্থাৎ ভারতে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের ফলে বিঘ্নিত। ভারত এসব নদীর পানি তাদের কৃষি ও অর্থনৈতিক কাজে অধিক মাত্রায় ব্যবহার করায় নদীগুলোর বাংলাদেশ অংশে পানিপ্রবাহ কমে গেছে।

গঙ্গা ও তিস্তা নদীতে এমন ধরনের বাঁধ ও ব্যারাজ নির্মাণ করায় এসব নদীতে পানিপ্রবাহ কমে এসব অঞ্চলে মাটির আর্দ্রতা কমিয়ে ফেলেছে। সেই সঙ্গে ভূগর্ভস্থ পানির আধার নিয়মিত পানি পাওয়া থেকে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পানির স্তর প্রতিবছরই নেমে যাচ্ছে। ফলে খরার তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছে।

খরা নিয়ে কী ধরনের রিপোর্ট হতে পারে

১. খরা উপদ্রুত এলাকায় জনগণ বিকল্প পদ্ধতিতে পানি আহরণ করছে কি না। এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কী। ঐ সব এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য খরা কতটুকু দায়ী।

২. প্রতিনিয়ত খরার সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার কী নীতি অনুসরণ করে আসছে এবং কী করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকার কি যথেষ্ট করছে? কী করা উচিত।

৩. পানির অভাব নিয়ে মানবিক আবেদন সৃষ্টি করে, এমন প্রতিবেদন।

৪. আন্তর্জাতিক নদীগুলোর অবস্থা এবং তার ওপর নির্ভরশীল উন্নয়নমূলক প্রকল্প, যেমন—তিস্তা নদীতে ব্যারাজগুলোর কী অবস্থা।

৫. নিয়মিত খরার কারণে কোনো জনপদ থেকে অন্যত্র অভিবাসন হচ্ছে কি না। তারা অন্যত্র গিয়ে কী করছে।

চ. নদীভাঙন

নদীভাঙন খুব নিবিড়ভাবে বন্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি বাংলাদেশের বদ্বীপ গঠন প্রক্রিয়ার একটি স্বাভাবিক অংশ। নদী প্রতিনিয়ত পলিমাটি বহন করে নিচু বন্যাপ্রবণ এলাকাকে ধীরে ধীরে উঁচু করে তোলে। সেই সঙ্গে নদীর তলদেশও পলি জমতে জমতে উঁচু হয়ে যায়। ফলে নদী গতিপথ পাল্টাতে থাকে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নদীর এক পাশে ভাঙন ঘটতে থাকে; আর অন্য দিকে ধীরে ধীরে চর জাগতে থাকে।

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ বলে এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটি মানুষকে সরাসরি আক্রান্ত করে। প্রতিবছর বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বহমান নদীগুলো এক ট্রিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি এক বিলিয়ন টন পলিমাটি নিয়ে যায় সমুদ্র পর্যন্ত। নদীতে যত পলিমাটি থাকবে, নদী তত গতিশীল হবে। যেহেতু বাংলাদেশের নদীগুলো পৃথিবীর অন্যতম পলিমাটির বাহক, সেহেতু নদীগুলো বেশি গতিশীল। বিজ্ঞানীরা গবেষণায় দেখেছেন যে, বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে যাওয়া আন্তর্জাতিক নদীগুলো বারবার গতি পরিবর্তন করেছে। এই পরিবর্তনের আরেকটি দিক হচ্ছে বাংলাদেশে বদ্বীপ হওয়ার প্রক্রিয়াটি চলমান, অর্থাৎ পলিমাটি জমে বাংলাদেশের নিচু জমি উঁচু হয়ে বসবাসযোগ্য হয়েছে—সেই প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রয়েছে।

কিন্তু এর মূল্য দিতে হয় নদীপারের মানুষগুলোকে, যাদের বাড়িঘর, জমি ও জীবিকা নদীভাঙনের সঙ্গে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এক ধনাঢ্য কৃষক নদীভাঙনের কারণে রাতারাতি গরিব হয়ে যেতে পারেন। পরবর্তী সময়ে নদীর অপর প্রান্তে জেগে ওঠা চরের ওপর ভূমি-অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সৃষ্টি হয় সংঘর্ষ। ফলে নদীপাড়ের মানুষের জীবনধারা এক সাংঘর্ষিক সংস্কৃতি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটে।

প্রতিবছর ৫০ হাজার মানুষ ভূমিহীন ও গৃহহীন হচ্ছে, নদীভাঙনে ৫ হাজার হেক্টর জমি বিলীন হয়ে যাওয়ার কারণে। এর মধ্যে গঙ্গা নদীর ভাঙনের হার হচ্ছে বছরে ১ হাজার হেক্টর জমি, যার মাধ্যমে ১০ হাজার মানুষ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। পদ্মা নদীতে বছরে ১ হাজার ৫০০ হেক্টর জমি হারিয়ে আরো ১৫ হাজার মানুষ নিঃস্ব হচ্ছে।

নদীভাঙন একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, যা থামাতে গেলে বিস্তৃতভাবে নিরাপত্তামূলক বাঁধ তৈরি করতে হয়। তবে বাঁধ থাকলেও তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে তৈরি না হলে ভাঙন বন্ধ করা যায় না। যেমন, সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধ প্রতিবছর ভেঙে যাচ্ছে। তবে কার্যকরী বাঁধ বেশ কিছু সময়ের জন্য ভাঙনকে থামিয়ে রাখতে পারে। যেমন, যমুনা নদীতে ৫৭৫ কিলোমিটার এলাকায় বাঁধ দেওয়ার ফলে এই নদীর বার্ষিক ভাঙনের মাত্রা ১০ হাজার হেক্টর থেকে কমে ৬ হাজার হেক্টরে নেমে এসেছে।

নদীভাঙন নিয়ে কী ধরনের রিপোর্ট হতে পারে

১. ভাঙনে আক্রান্ত জনপদের মানুষ কীভাবে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করছে। কেউ তাদের সহায়তা করছে কি না।

২. ইতিমধ্যে ভাঙনে নিঃস্ব ব্যক্তিরা বর্তমানে কীভাবে জীবন ধারণ করছে। এখানে মানবিক আবেদনসম্পন্ন প্রতিবেদন তৈরি করা যায়।

৩. নদীভাঙন এবং নতুন জমি বা চর দখলের চেষ্টার ফলে উদ্ভূত সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির ওপর অনুসন্ধানীমূলক রিপোর্ট হতে পারে।

৪. সরকার ভাঙন রোধে যেসব বাঁধ তৈরি করেছে তা কার্যকরী হচ্ছে কি না। যেমন, সিরাজগঞ্জ বাঁধ কেন কাজ করছে না। এতে কত টাকা অপচয় হলো এবং ঐ জনপদ শেষ পর্যন্ত কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

৫. ভাঙন রোধে সরকারের নীতি ও উদ্যোগ যথেষ্ট কি না; না হলে কেন যথেষ্ট নয়।

৬. যেসব এলাকায় ভাঙনের ঝুঁকি বেড়ে গেছে, তার ওপর রিপোর্ট হতে পারে। এখানে রিপোর্টার দেখবেন, এই ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার কারণ গুলো কী এবং এর ফলে কী কী ক্ষতি হতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়

শব্দকোষ

AFFORESTATION
বনায়ন

Afforestation
বনায়ন

সাধারণত পতিত জমি, পাহাড়ি এলাকা, নদী ও রাস্তার পাড় প্রভৃতি এলাকায় বিভিন্ন ফলমূল ও অর্থকরী গাছ রোপণ করে বন সৃষ্টি করাকে বনায়ন বলে। অন্যভাবে বলা যায়, বিশ্বের প্রতিটি দেশে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে বৃক্ষ বা গাছপালার বহুমুখী গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরিকল্পিত ও সুবিন্যস্তভাবে বৃক্ষরোপণ করাকে বনায়ন বলে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে দেশের মোট ভূমির ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা আবশ্যক। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় ১৮ শতাংশ বনভূমি রয়েছে। তবে ২০১৫ সালের মধ্যে বনভূমির পরিমাণ ২০ শতাংশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

Deforestation
বন উজাড়করণ

গাছপালা কেটে ফেলা ও বিরান হয়ে যাওয়া বনভূমি এলাকাগুলোর পুনরায় বনভূমি হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা না থাকাই হচ্ছে বনভূমি অবনয়ন বা বন উজারকরণ। গাছ জন্মানোর ক্ষমতার চেয়ে অধিক বৃক্ষ কর্তনের ফলে বনভূমি হ্রাস পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বনভূমির গাছপালার কাটা হয়, কিন্তু বাংলাদেশে অবৈধভাবে বৃক্ষনিধনের ঘটনাও ঘটে। বন উজাড়করণ ও জলবায়ুর পরিবর্তন মরুকরণের প্রধান কারণ। বাংলাদেশে এই দুটি নিয়ামক বিদ্যমান থাকায় সমস্যাটি দিনে দিনে প্রকট হয়ে উঠছে।

শুষ্ক মৌসুমে উজানের দেশ কর্তৃক গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যায়। ফলে বাংলাদেশের সমগ্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মৃত্তিকার পানি উচ্চ হারে নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং এর পরিণতিতে ওই অঞ্চল মরুকরণ প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত হয়। এই বিপর্যয় এড়ানোর জন্য দেশের অভ্যন্তরে পানি সঞ্চয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

মরুকরণ প্রক্রিয়ার প্রধান নিয়ামক ও কারণগুলো জৈব, ভৌত, আর্থসামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয়াদির ভিত্তির ওপর নিহিত। ভূমিরূপ, যা মুক্তিকা ক্ষয় প্রক্রিয়া, পানিসাম্য

পরিবর্তন, পানিসম্পদের বেশি ব্যবহার, কৃষিকাজের নিবিড়করণ, জনসংখ্যার চাপ, নগরায়ণ, শিল্প সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়কে আনুকূল্য প্রদান করে ভূমির অবনয়ন ঘটায়। ধাপে ধাপে ভূমি অবক্ষয় প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে মরুকরণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে এবং ধাপগুলো সাধারণত নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণে হয়ে থাকে—

- মৃত্তিকায় গাছপালার আচ্ছাদন ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়া
- মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া
- মৃত্তিকা সংযুক্তির বিকীর্ণন ও মৃত্তিকাপৃষ্ঠ বন্ধ হয়ে যাওয়া
- পৃষ্ঠ গড়ানো পানি ও মৃত্তিকাবস্তুর স্থানান্তর
- মৃত্তিকা অবনয়নের চূড়ান্ত পর্যায় তথা মরুকরণ।

বর্তমানকালের মরুকরণ প্রক্রিয়ার অধিকাংশই সাম্প্রতিক বা দূরবর্তী সময়কালের ঐতিহাসিক ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট। এসব নিয়ামক ও কারণগুলো বিভিন্ন স্থানিক (Spatial) ও কালিক (Temporal) প্রেক্ষাপটে মরুকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলোকে প্রভাবিত করে। স্থানভেদে মরুকরণ প্রক্রিয়ার হারে ভিন্নতা ঘটে। প্রধানত বৃষ্টিপাত ও জৈব-জলবায়ুগত স্থিতিমাপসহ জলবায়ুর পার্থক্য এবং পরিবেশের ওপর মানুষের ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডের তীব্রতার পার্থক্যের কারণে মরুকরণ প্রক্রিয়াও স্থানভেদে ভিন্ন তথা কমবেশি হয়ে থাকে।

ARSENIC
আর্সেনিক

Arsenicosis
আর্সেনিকোসিস

পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন এবং অদাহ্য গুণাবলির জন্য আর্সেনিক সহজেই খাদ্য ও পানীয়র সঙ্গে মানব-শরীরে প্রবেশ করতে পারে। আর্সেনিকের প্রভাবে মানবদেহে সৃষ্ট ক্ষত থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। বায়ু আর্সেনিক দ্বারা দূষিত হলে বাতাসের মাধ্যমে মানবদেহে আর্সেনিক-দূষণ ঘটে। সাধারণত এই বায়ুদূষণ ঘটে কলকারখানা এলাকায়, যেখানে কাঁচামাল হিসেবে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক কারণে খাদ্যের মাধ্যমে, যেমন—শাকসবজি, জলজ উদ্ভিদ বা সামুদ্রিক মাছ, ইত্যাদি খাবারের মাধ্যমে আর্সেনিক শরীরে প্রবেশ করতে পারে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ খাদ্যের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে ০.০২৫ মিলিগ্রাম থেকে ০.০৫ মিলিগ্রাম আর্সেনিক গ্রহণ করতে পারে। তবে এই জৈব আর্সেনিক মানুষের শরীরে প্রবেশের পর প্রধানত মূত্রপথে বেরিয়ে যায়। ফলে খাদ্যদ্রব্য থেকে গৃহীত জৈব আর্সেনিক

মানুষের শরীরে সাধারণত কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক অনেক দিন গ্রহণ করলে বিভিন্ন কলাতন্ত্রে জমা হতে হতে যখন সহনীয় মাত্রা অতিক্রম করে, তখন শরীরে বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়।

সাধারণত একজন স্বাভাবিক পুষ্টিমানসম্পন্ন মানুষ আর্সেনিক-দূষিত পানি পান করতে আরম্ভ করার পর ৮ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে তার শরীরের ত্বকে রোগের লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে। এই দূষণের কারণ যদি খাওয়ার পানি হয়, তাহলে আর্সেনিকের পরিমাণ, ব্যক্তির শারীরিক পুষ্টির মান, অভ্যন্তরীণ রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতা এবং কত দিন ধরে আর্সেনিক-দূষিত পানি পান করছে, ইত্যাদির ওপর রোগের লক্ষণ প্রকাশের কাল নির্ভর করবে। সহনীয় মাত্রার অধিক আর্সেনিক দীর্ঘদিন ধরে মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে মানব-শরীরে যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায় তাকে 'আর্সেনিকোসিস' রোগ বলে। তিনটি স্তরে রোগের উপসর্গ প্রকাশ পায়।

BIODIVERSITY
জীববৈচিত্র্য

Biodiversity
জীববৈচিত্র্য

উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবসহ গোটা জীবসম্ভার, তাদের অন্তর্গত জিন ও সেগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বাস্তুতন্ত্রকে (জীববৈচিত্র্য) বলে। বস্তুত ক্রমবিবর্তন এবং পৃথিবীতে জীবের বিকাশ লাভের ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। জীববৈচিত্র্য প্রজাতি বিলুপ্তি ঠেকাতে সহায়তা জোগায়, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে। জীববৈচিত্র্যের একটি মৌলিক উপাদান হলো 'মানব প্রজাতি'। অন্যান্য উপাদানের মতো প্রাকৃতিক উপায়ে মানব প্রজাতিরও অভিযোজন ঘটেছে। এই মানব প্রজাতি তার নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে জীববৈচিত্র্যের অন্যান্য প্রজাতি এবং বাস্তুতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব বা উপযোগিতা বুঝতে জীববৈচিত্র্যের উৎস থেকে উৎপাদিত মানুষের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় উপাদান ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমন—

খাদ্যশস্য : বিশ্বব্যাপী আনুমানিক ২৫০ হাজার সপুষ্পক উদ্ভিদ রয়েছে। এর মধ্যে কয়েক হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ প্রত্যক্ষভাবে মানুষের, গৃহপালিত পশুপাখি ও খামারজাত প্রাণীর খাদ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার সব গৃহপালিত পশু ও খামারজাত প্রাণী কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যও মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আনুমানিক ২০০টি উদ্ভিদ প্রজাতি 'খাদ্য উদ্ভিদ' হিসেবে চাষাবাদ করা হয় এবং এই ২০০টির মধ্যে ১৫-২০টি প্রজাতির বিশেষ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

কাঠ : যেসব বস্তু মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক এবং বিশ্বব্যাপী বণিজ্যকৃত তার মধ্যে কাঠ উল্লেখযোগ্য। কাঠ ব্যবহৃত হয় ঘরবাড়ি নির্মাণ, আসবাবপত্র ও কাগজ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে। সর্বোপরি জ্বালানিশক্তি হিসেবে কাঠের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। অরণ্য বা বন হলো প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট কাঠের প্রধান উৎসস্থল। বাড়িঘর নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় নরম কাঠ পাওয়া যায় অরণ্যে। অপরদিকে শক্ত ও অতি মূল্যবান কাঠ যেমন– শাল, সেগুন, মেহগনি, নিম প্রভৃতি যা আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহার করা হয়, তা মূলত প্রাকৃতিক অরণ্য এবং কিছু ক্ষেত্রে স্বল্প পরিচালনাযুক্ত অরণ্যে উৎপন্ন হয়।

মাছ : মাছ এবং মাছ থেকে পাওয়া খাদ্য-উপাদান প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ। মাছের উৎপাদনে বেশি অবদান সমুদ্রের। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্র, বিশেষ করে ঘের, পুকুর, নালা নর্দমা, খাল-বিল ও নদী-নালায় মাছ উৎপাদন করা হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট নানা কারণে দিন দিন পানিদূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিরল প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হচ্ছে অর্থাৎ জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে।

কৃষিসংক্রান্ত 'জিন' সম্পদ : স্থানীয় আদিম শস্য প্রজাতি এবং পশু-সম্পত্তির মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত 'জিন' মানব প্রজাতির অস্তিত্ব ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি অতি প্রয়োজনীয় সম্পদ। জীব প্রযুক্তি এবং প্রজনন-সংক্রান্ত প্রজাতির প্রধান উৎসস্থল হলো এই জিনপুল। আদিম বৈচিত্র্যপূর্ণ জিনপুলের অপর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা যেকোনো প্রাকৃতিক পরিবেশে অঙ্কুরিত হতে পারে এবং রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। আদিম শস্য ও পশু-সম্পত্তির বৈচিত্র্যপূর্ণ জিনের সংরক্ষণ এবং বাণিজ্যিকীকরণ অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Climate Change and Biodiversity
জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য

জলবায়ু পরিবর্তন ও মরুকরণ দুটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া হলেও একটি অবিরত আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। জলবায়ুর পরিবর্তন মরুকরণের অবস্থা নির্ধারণ করে এবং মরুকরণ প্রক্রিয়া বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন প্রভাবকারী শক্তি ও পানির প্রবাহ বিভাজন ক্রিয়াকে পরিবর্তন করে থাকে। মানুষের কর্মকাণ্ড দ্বারা উভয়ের বিবর্তন প্রভাবিত হয়। বিগত শতাব্দীতে প্রধানত মানবসভ্যতার উন্নয়নের ফলে জলবায়ু ও জীববৈচিত্র্যের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ ছাড়া জলবায়ুগত পরিবর্তন, তথা বিশ্ব উষ্ণায়ন ও খরার মধ্যকার সহযোগিতামূলক আন্তঃক্রিয়া মরুকরণের অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করে থাকে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমাঞ্চলে এই পরিস্থিতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে বিগত কয়েক দশকে খরা সংঘটন, ভূগর্ভস্থ পানির অত্যধিক উত্তোলন এবং মৃত্তিকা লবণাক্তকরণ প্রক্রিয়াগুলো সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। গঙ্গার উজানে অবস্থিত দেশ কর্তৃক একতরফাভাবে নদীর পানি প্রত্যাহারের ফলে ভাটি অঞ্চলের মাটির পানি নিঃশেষ হচ্ছে। ফলে এসব এলাকার

পরিচিত গাছ ও অনেক প্রজাতির প্রাণীর টিকে থাকা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, যেগুলো দেশের জীববৈচিত্র্যের সমৃদ্ধিতে অনেক অবদান রাখছে। জলবায়ুর পরিবর্তন জীববৈচিত্র্যের ওপর হুমকিস্বরূপ। জলবায়ু পরিবর্তন ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যকে প্রভাবিত করছে এবং এটা চলতে থাকবে।

BUILDING CODE
বিল্ডিং কোড

Building Code
বিল্ডিং কোড

বিল্ডিং কোড হচ্ছে জাতীয়ভাবে অনুমোদিত নীতিমালা, যা আদর্শ অবকাঠামোর ডিজাইন ও রক্ষাণাবেক্ষণের লক্ষ্যে তৈরি। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিরাপত্তা, যথোপযোগিতা ও কার্যকারিতার আলোকে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে এবং দেশের ভূতাত্ত্বিক অবস্থা বিবেচনা করে বাংলাদেশ বিল্ডিং কোড গৃহীত হয়েছে।

ইমারত নির্মাণে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে নিরাপদ, সহজ ব্যবহারোপযোগী, স্বাস্থ্যসম্মত জনকল্যাণমুখী অবকাঠামো নির্মাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৫২ গৃহীত হয়। এই বিধিমালা অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইমারত নির্মাণ করলেও তা যথোপযুক্ত বলে মনে হয়নি। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৯ সালে গঠিত কমিটি বিধিমালা পর্যালোচনা করে। পরবর্তী সময়ে এটিকে আরো আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকের মাধ্যমে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রযুক্তি ও অর্থের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে দেশীয় প্রযুক্তিতে সাশ্রয়ী নির্মাণের জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক নির্বাহী কমিটির নিকট একটি প্রস্তাবনা পেশ করে, যা পরবর্তী সময়ে কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

স্টিয়ারিং কমিটি একটি খসড়া বিল্ডিং কোড তৈরির জন্য Development Design Consultant Limited-কে দায়িত্ব প্রদান করে এবং প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯২ সালের ১ জুন থেকে এ বিষয়ে কাজ শুরু করে। পরবর্তী সময়ে 'The Committee of Experts on Earthquake Hazards Minimization' নামে সরকারিভাবে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং ঐ কমিটির চূড়ায় রিপোর্ট 'Seismic zoning map of Bangladesh and outline of a code for earthquake resistant design of structures' নামে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর প্রকাশ করে। এরই

ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোডে ভূকম্পন থেকে রক্ষার জন্য কার্যকরী নকশা বিশদভাবে উল্লেখ করা আছে। দ্য হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ স্টান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের যৌথ উদ্যোগে এটি প্রকাশিত হয়।

Adaptation to Climate Change
জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অভিযোজন

আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও নিজেদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও অভিঘাত মোকাবিলায় সকলের সর্বস্তরে খাপ খাওয়ানো ও অভিযোজনে করণীয় ও দায়িত্ব রয়েছে।

উন্নয়ন খাতগুলোয় অভিযোজনের সুযোগ ও কৌশলের একটি নমুনা তালিকা নিচে দেওয়া হলো—

খাতগুলো	অভিযোজনের সুযোগ ও কৌশল
পানি	বৃষ্টির পানি ধারণ : পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কৌশল রপ্ত করা; ব্যবহৃত পানি পুনরায় ব্যবহার; লবণাক্ততা দূরীকরণ; পানির ব্যবহার ও সেচে দক্ষতা অর্জন
কৃষি	চারা রোপণের সময় নির্ধারণ; শস্যবৈচিত্র্য; ভূমি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, যেমন—বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে ভূমি-ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ
অবকাঠামো	পুনর্বাসন; ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধক্ষম বসতি ও মাছ ধরার নৌকার কাঠামো উন্নয়ন ও স্থায়িত্বশীল বাঁধ নির্মাণ; প্রাকৃতিক জলাশয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা
জনস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য পরিসেবা; জরুরি স্বাস্থ্যসেবা; জলবায়ুজনিত রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ; বিশুদ্ধ পানি ও উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
যোগাযোগ	পুনর্বিন্যাস ও পুনর্বাসন; রাস্তার নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন; নিষ্কাশন-ব্যবস্থাসহ মানানসই অবকাঠামো নির্মাণ করা
শক্তি	বণ্টন-ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ; জ্বালানির সুব্যবহার; পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ উৎসের ব্যবহার; একটিমাত্র শক্তির উৎস থেকে নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে

Global Warming
বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নামে অভিহিত। এই উষ্ণতা দ্রুত গতিতে বাড়ছে। ইতিমধ্যে অনেক দেশ এবং এর জনগণ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের আবহাওয়ার ধরন ও ঋতুবৈচিত্র্য পাল্টে দিচ্ছে। এর ফলে

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন—অতিবৃষ্টি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি ঘটার সম্ভাবনা ও ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এসব দুর্যোগে শত শত মানুষের মৃত্যু ঘটছে এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদহানি হচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে লাখ লাখ মানুষের জীবিকার ওপর।

গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর মধ্যে গত শতাব্দীতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ২৫ শতাংশ, নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ ১৯ শতাংশ এবং মিথেনের পরিমাণ ১০০ শতাংশ বেড়েছে (চতুর্থ সমীক্ষাপত্র, আইপিসিসি), যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের অন্যতম প্রধান কারণ।

Green House Gas
গ্রিন হাউস গ্যাস

বিভিন্ন গ্যাস দিয়ে তৈরি পৃথিবীর এ বায়ুমণ্ডল। তার মূল উপাদান নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। এগুলো ছাড়াও নগণ্য পরিমাণে কার্বনডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড আছে। আরো আছে জলীয় বাষ্প ও ওজোন। বায়ুমণ্ডলের গৌণ গ্যাসগুলোই গ্রিন হাউস গ্যাস। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট গ্যাস ছাড়াও মনুষ্যসৃষ্ট সিএফসি ও এইচসিএফসি, হ্যালন ইত্যাদি গ্যাসও বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হয়েছে।

Green House Effect
গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া

শীতপ্রধান দেশে সাধারণত একধরনের স্বচ্ছ কাচের ঘরে তরিতরকারি ও শাকসবজির চাষ করা হয়। ফসল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম উপায়ে এসব ঘরের আবহাওয়া প্রয়োজন অনুযায়ী গরম রাখা হয়। এসব ঘরকেই বলে গ্রিন হাউস। সূর্যের আলো ও তাপ কাচের মধ্য দিয়েই ঘরে প্রবেশ করে, কিন্তু বিকিরণের সময় সমুদয় তাপ বের হয়ে আসতে পারে না। ফলে বাইরের তুলনায় ঘরের ভেতরে উচ্চতা বেশি বজায় থাকে। সূর্যের আলো ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে তোলে। বিকিরণ প্রক্রিয়ায় এই তাপ আবার উর্ধ্বাকাশে ফিরে যেতে চায়; যদিও থেকে যায়। যার ফলে বায়ুমণ্ডল তথা ভূপৃষ্ঠ উষ্ণ থাকে এবং জীবনের বেঁচে থাকার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এভাবে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া প্রাকৃতিকভাবেই ঘটে। বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন ছাড়াও নগণ্য পরিমাণে অন্যান্য গ্যাস আছে। এ ধরনের গ্যাসগুলো হচ্ছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন, ওজোন ইত্যাদি। এসব গ্যাসই এ ধরনের তাপগুলো ধরে রাখে। বিগত ২০০ বছরে শিল্পবিপ্লব-উত্তরকালে মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলোর অনুপাত পরিবর্তিত হয়েছে। এ কারণে বাতাসের তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বায়ুমণ্ডলে এসব গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে বলে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে বা তাপমাত্রার তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছে।

Atmospheric Pressure and Air Stream

বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও বায়ুপ্রবাহ

শীত ও গ্রীষ্মের ঋতুগত বৈপরীত্য দ্বারা বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও বায়ুপ্রবাহ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে থাকে। শীত মৌসুমে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটি শীতল বায়ুস্রোতে পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হয়, যা বাংলাদেশের প্রবেশ করে। এই বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের শীতকালীন মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের একটি অংশ। এভাবে শীতকালে দেশের অভ্যন্তরে বায়ু সাধারণত উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে গ্রীষ্মকালে ভূপৃষ্ঠের প্রচণ্ড উত্তাপে ভারতের পশ্চিম কেন্দ্রভাগ জুড়ে একটি নিম্নচাপ উল্লিখিত নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। আরব সাগর থেকেও ভারত অভিমুখী অনুরূপ বায়ুপ্রবাহের দক্ষিণ প্রবণতা বিদ্যমান থাকে, তথা এ সময় বায়ু দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম অথবা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়। তাবে ঋতুর পরিবর্তনশীল পর্যায়গুলোতে, যেমন—বসন্ত ও হেমন্তকালে বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তনশীল থাকে। সাধারণত, শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালের বায়ুপ্রবাহের শক্তি অপেক্ষাকৃত তীব্র হয়ে থাকে। শীতকালের বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ ঘণ্টায় সাধারণত তিন থেকে ছয় কিলোমিটার হয়ে থাকে, আর গ্রীষ্মকালে এই গতিবেগ থাকে ৮ থেকে ১৬ কিলোমিটার। বায়ুমণ্ডলের গড় চাপ জানুয়ারি মাসে ১ হাজার ২০ মিলিবার এবং মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তা ১ হাজার ৫ মিলিবার পর্যন্ত বজায় থাকে।

Depression

নিম্নচাপ

যদি কোনো এলাকায় চারপাশের তুলনায় বায়ুর চাপ কম থাকে, তবে সে অবস্থাকে বলা হয় নিম্নচাপ। নিম্নচাপ বলতে ঘূর্ণিঝড় ধরনের আবদ্ধ নিম্নচাপ এলাকা অথবা উন্মুক্ত ভি-আকৃতির নিম্নচাপপূর্ণ বায়ুমণ্ডলীয় খাদকেও বোঝায়। এই নিম্নচাপ সচরাচর ভারত মহাসাগরের গভীর এলাকায় অথবা বঙ্গোপসাগরে উৎপন্ন হয়ে থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের সময় এই নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। নিম্নচাপের প্রভাবে বাংলাদেশসহ আশপাশের অঞ্চলে প্রায় ৭ থেকে ১০ দিন একটানা ভারী বর্ষণ হয়ে থাকে এবং কখনো কখনো সিলেট ও কক্সবাজার এলাকায় দুই থেকে তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে বর্ষণ অব্যাহত থাকে।

Dew

শিশির

জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু ভূপৃষ্ঠের ওপর শীতল কোনো বস্তুর সংস্পর্শে এলে ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা আকারে গাছ ও ঘাসের ওপর জমা হয়, যাকে শিশির বলে।

Dew Point
শিশিরাঙ্ক
যে তাপে বায়ু সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে সে তাপমাত্রাকে শিশিরাঙ্ক বলে। এই অবস্থায় বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১০০ শতাংশ। বায়ুর তাপমাত্রা শিশিরাঙ্কের নিচে নেমে গেলে বায়ুতে ঘনীভবন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

Evaporation
বাষ্পীভবন
যে প্রক্রিয়ায় কোনো তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয় তাকে বাষ্পীভবন বলে। পানি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয়।

Evapo-transpiration
বাষ্পীভবন-প্রস্বেদন
বাষ্পীভবন দ্বারা মৃত্তিকা ও জলভাগ থেকে এবং প্রস্বেদন দ্বারা উদ্ভিজ্জ থেকে জলীয় পদার্থ অপচয় হয়। এভাবে কোনো এলাকায় মৃত্তিকা, জলভাগ ও উদ্ভিজ্জ থেকে যে পরিমাণ পানির অপচয় হয় তাকে বাষ্পীভবন-প্রস্বেদন বলে।

Fog
কুয়াশা
আর্দ্র বায়ু ভূপৃষ্ঠের নিকটস্থ শীতল পৃষ্ঠের সংস্পর্শে এসে ঘনীভূত এবং অতি সূক্ষ্ম জলকণায় পরিণত হয়। এসব সূক্ষ্ম জলকণা এতই হালকা থাকে যে ভূপৃষ্ঠে বারিবিন্দু আকারে পতিত না হয়ে ভূসংলগ্ন এলাকায় মেঘের মতো ভেসে বেড়ায়। দেখতে ধোঁয়ার মতো এবং এতে দৃশ্যমানতা হ্রাস পায়। একেই কুয়াশা বলে।

Humidity
আর্দ্রতা
বাংলাদেশে প্রায় সারা বছর জুড়েই উচ্চ আর্দ্রতা বিরাজমান থাকে। দেশের পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে মার্চ-এপ্রিল মাসে সর্বাপেক্ষা কম আর্দ্রতা পরিলক্ষিত হয়। মার্চ মাসে দিনাজপুরে সর্বনিম্ন গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা (৫৭ শতাংশ) পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাগুলো নিম্নতম আর্দ্র মাসগুলো হচ্ছে জানুয়ারি থেকে মার্চ। এ এলাকায় সর্বনিম্ন মাসিক আর্দ্রতা রেকর্ড করা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মার্চ মাসে (৫৮.৫ শতাংশ)। জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে দেশের সর্বত্র আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০ শতাংশের বেশি থাকে। জুলাই অথবা আগস্ট মাসে সম্পৃক্তি ঘাটতি (Saturation deficit) সবচেয়ে কম হয়ে থাকে। সেপ্টেম্বর মাসে আর্দ্রতা চরমে পৌছায়। এ সময় বৃষ্টিপূর্ণ দিনের সংখ্যাও খুব বেশি হয় না। ভ্যাপসা গরম আবহাওয়ায় মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বার্ষিক গড়

আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিসীমাটি হলো কক্সবাজারে সর্বোচ্চ ৭৮.১ শতাংশ থেকে পাবনায় সর্বনিম্ন ৭০.৫ শতাংশ পর্যন্ত।

Hydraulic Erosion
জলীয় ক্ষয়সাধন

নদীর স্রোত বা ঢেউয়ের আঘাতে নদী উপত্যকায় যে ক্ষয় হয় তাকে জলীয় ক্ষয়সাধন (Hydraulic Erosion) বলে। সামুদ্রিক ঢেউয়ের আঘাতে একইভাবে উপকূলের ক্ষয়সাধন হয়ে থাকে।

COLD WAVE
শৈত্যপ্রবাহ

Cold Wave
শৈত্যপ্রবাহ

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার হিমালয় আবহাওয়ামণ্ডলীয় দেশ। ঋতুচক্রে পৌষ ও মাঘ মাস শীতকাল হলেও দেশের উত্তরাঞ্চলে শীত অনুভূত হয় হেমন্তের আগমন থেকে। শীতকালে বাতাসের তাপমাত্রা যখন ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায়, তখন একে শৈত্যপ্রবাহ বলে। প্রকৃতপক্ষে কোনো কোনো বছর তীব্র শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয় এই পৌষ-মাঘ মাসেই। মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ প্রায় প্রতিবছরই হয়ে থাকে। শীতের শুষ্ক আবহাওয়ায় শৈত্যপ্রবাহে বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে যায়, পারিপার্শ্বিকতা ঘন কুয়াশায় আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। যেহেতু সূর্যালোক ঘন কুয়াশা ভেদ করতে পারে না, ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হওয়ার মতো পর্যাপ্ত তাপ গ্রহণ করতে পারে না, সেজন্য শীতের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৪.১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বাতাস, বাতাসের গতিবেগ, তাপমাত্র, বৃষ্টিপাত ও কুয়াশা শীতের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে থাকে। ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুপ্রবাহ যখন বাংলাদেশের ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি নেমে আসে, তখন দেশ শৈত্যপ্রবাহের কবলে পড়ে। ঊর্ধ্বাকাশের এই বায়ুপ্রবাহ স্বাভাবিকভাবে থাকার কথা ২৪ হাজার ফুট ওপরে। নিচে নেমে এই বায়ুপ্রবাহ সাগরপৃষ্ঠ থেকে সংগ্রহ করে অপরিমের জলীয় বাষ্প, তারপর তা ছেড়ে দেয়। বাংলাদেশের শীতকালীন বাতাসের মধ্যেই এই আর্দ্র বায়ু শীতের কষ্ট ভয়াবহভাবে বাড়িয়ে দেয়। এই বায়ুস্থ জলীয় বাষ্প আবার নিজস্ব সুপ্ততাপ ত্যাগ করে ঘন কুয়াশার স্তর ভেদ করে সূর্যের তাপ ঠিকমতো পৌছাতে পারে না ভূপৃষ্ঠে। ফলে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হওয়ার মতো পর্যাপ্ত সূর্যতাপ পায় না। তখন কনকনে শীত অনুভূত হয়। এ ছাড়া ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুপ্রবাহ কখনো কখনো আবার

উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত না হয়ে বর্ষাকালীন মৌসুমি বায়ুর মতো দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। এই কারণেও শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

তাপমাত্রাভেদে শৈত্যপ্রবাহ চার প্রকার :

প্রকার	তাপমাত্রা
মৃদু শীত	(৮-১০) ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে
মাঝারি শীত	(৬-৮) ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে
প্রচণ্ড শীত	(৪-৬) ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে
অতীব প্রচণ্ড শীত	৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায়

স্থায়িত্বভেদে শৈত্যপ্রবাহ তিন প্রকার, যথা :
স্থিতিকাল প্রকার

- ✓ এক থেকে তিন দিন পর্যন্ত স্বল্পকালীন
- ✓ তিন থেকে পাঁচ দিন পর্যন্ত মাঝারি
- ✓ পাঁচ দিনের বেশি দীর্ঘমেয়াদি

COMMUNITY
সমাজ

Community Based Disaster Risk Management (CBDRM)
সমাজভিত্তিক দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী নিজেরাই দুর্যোগের ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে। যার ফলে এক দিকে যেমন তাদের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস পায় তেমন দুর্যোগ মোকাবিলায় তাদের সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সমর্থন ও সহযোগিতা আদায়। সুতরাং সমাজভিত্তিক দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে কমিউনিটির সরাসরি অংশগ্রহণে বিপদাপন্নতা কমানো এবং যেসব দুর্যোগের মুখোমুখি তারা হয়, সেগুলোর ঝুঁকি মোকাবিলার ক্ষমতা বাড়ানো। অর্থাৎ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, স্থায়িত্বশীল সমাজভিত্তিক দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সবার আবেদনকে স্বীকার করা, স্থানীয় জনগণের

আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি এবং দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা হচ্ছে সমাজভিত্তিক দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

স্থায়িত্বশীল কোনো কার্যক্রমের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে কাজ করার মৌলিক শর্তই হচ্ছে মানুষের সক্ষমতার বিকাশ বা মানবসম্পদ উন্নয়ন। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীরই রয়েছে নির্দিষ্ট অবদান রাখার সুযোগ। যেমন—ছাত্রছাত্রী বা কিশোর-কিশোরী এবং যুবশক্তির প্রাণচাঞ্চল্য ও কর্মশক্তি, প্রবীণদের অভিজ্ঞতামিশ্রিত জ্ঞান, পরিবারের কল্যাণ ও সংসারের প্রয়োজনীয় অবদান রাখার জন্য নারী-পুরুষের উদ্যোগ ইত্যাদি। সমাজভিত্তিক দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যই হচ্ছে তাদের অবদানকে গ্রহণ ও স্বীকৃতি দেওয়া, যাতে এরা সবাই দুর্যোগ মোকাবিলায় কিছু না কিছু ভূমিকা রাখতে পারে।

শুধু তৃণমূল জনগোষ্ঠী নয়, এই প্রক্রিয়ায় পুরো সফলতা লাভের জন্য সরকার ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

COPING
খাপ খাইয়ে নেওয়া

Indigenous Coping Mechanism
লোকজ খাপ খাইয়ে নেওয়ার পদ্ধতি

একটি কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের লোকজ জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাবিত কৌশল, যা দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাসে সহায়ক। এ ধরনের কৌশল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই আচরণ ও পদ্ধতিগুলো তাদের অভিজ্ঞতা, সামাজিক অবকাঠামো, সম্পদ, নীতি, মূল্যবোধ ও সক্ষমতার সম্মিলিত প্রয়াস।

CONTINGENCY PLAN
আপদকালীন পরিকল্পনা

Contingency Plan
আপদকালীন পরিকল্পনা

আপদকালীন পরিকল্পনা হচ্ছে দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি আগাম পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলার একটি পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি স্থির করা হয়। বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের কাছে

আপদকালীন পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, এ ধরনের পরিকল্পনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজকে এমন একটি কাঠামোর মাধ্যমে বিন্যস্ত করে, যাতে জনগণ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা সফলভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার এ ধরনের আগাম পরিকল্পনা মূলত একটি দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক উপকরণ। একটি আপদকালীন পরিকল্পনাতে যে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়, সেগুলো হলো :

- ✓ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ
- ✓ চাহিদা নিরূপণ (দ্রুত দুর্যোগপ্রবণ জনগোষ্ঠীর)
- ✓ সম্পদ সংগ্রহের পরিকল্পনা
- ✓ দায়িত্ব বন্টন
- ✓ সংগঠন, সমাজ ও পরিবার

বিভিন্ন স্তরে প্রস্তুতি গ্রহণের কর্মসূচি পরিকল্পনা

আপদকালীন পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে—দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন স্তরে সাংগঠনিক প্রস্তুতি; সম্ভাব্য দুর্যোগের প্রভাব, বিস্তৃতি ও জনগোষ্ঠীর চাহিদা নিরূপণ; সংগঠনের/সংস্থার বিভিন্ন স্তরে প্রস্তুতি ও দায়িত্ব বন্টন/অংশগ্রহণের কাঠামো প্রণয়ন; বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার পরিকল্পনা প্রণয়ন; জনগোষ্ঠী, দাতা সংস্থা ও অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোর প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা; সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল নিরূপণ এবং এর উৎস চিহ্নিতকরণ; সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য একটি সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত পরিকল্পনা প্রণয়ন।

CYCLONE
ঘূর্ণিঝড়

Cyclone
ঘূর্ণিঝড়

প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড় হলো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় বা বায়ুমণ্ডলীয় একটি উত্তাল অবস্থা, যা বাতাসের প্রচণ্ড ঘূর্ণায়মান গতির ফলে সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিঝড়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ (Cyclone) গ্রিক শব্দ কাইক্লোস (Kyklos) থেকে এসেছে। কাইক্লোস শব্দের অর্থ কুণ্ডলী পাকানো সাপ। স্থানীয় ভাষায় ঘূর্ণিঝড়কে তুফান বলা হয়।

অত্যধিক গরম ও তীব্র রোদের কারণে কোনো স্থানের বাতাস হালকা হয়ে ওপরে উঠে গেলে ওই স্থানে বাতাসের চাপ কমে ফাঁকা হয়ে যায় আর সেই ফাঁকা জায়গা দখল

করতে তীব্র বেগে চারদিক থেকে মেঘ বৃষ্টিসহ ঘুরতে ঘুরতে ছুটে আসা ভারী বাতাস ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করে। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় গভীর সমুদ্রে আর তার জন্য দরকার সমুদ্রের ২৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা তার চেয়েও বেশি তাপমাত্রা। যেসব সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কম সেসব সমুদ্রে খুব একটা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হতে দেখা যায় না। বাংলাদেশে সাধারণত বর্ষা মৌসুমের আগে ও পরে উষ্ণতার কারণে সাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। আর নিম্নচাপ থেকেই ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম হয়। সাগরে কোথাও নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে আশপাশের অঞ্চল থেকে বাতাস নিম্নচাপ অঞ্চলে ছুটে আসে। বাতাস দ্রুত পাক খায় আর ওপরের উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় যে জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হয় তা ক্রমশ আরো ঘনীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। ঘূর্ণিঝড়কে এই মেঘ আরো শক্তিশালী করে তোলে। ঘূর্ণিঝড় উপকূল থেকে যত দূরে সৃষ্টি হয় তার শক্তি তত বেশি থাকে। স্থলভাগে আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়ের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গ্রীষ্মকালের শুরু ও শেষের সময় সবচেয়ে বেশি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়ে থাকে। অর্থাৎ বাংলা বছরের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (ইংরেজি এপ্রিল-মে) এবং আশ্বিন-কার্তিক (ইংরেজি অক্টোবর-নভেম্বর) মাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়ে থাকে। বছরের অন্যান্য সময়ও ঘূর্ণিঝড় হয়, তবে তার সংখ্যা ও শক্তি উভয়ই উল্লিখিত সময়ে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের চেয়ে তুলনামূলক কম।

দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে কিংবা আন্দামান অথবা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কাছে সৃষ্ট নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হয়ে উত্তর দিকে সরে আসে, তখন তার পশ্চিম ও পূর্ব দিকে পাহাড়ি স্থলভাগ থাকায় সে সমুদ্রপৃষ্ঠে উত্তর দিকে যতই স্থান পরিবর্তন করতে থাকে ততই সে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের কাছাকাছি এসে পৌঁছায়। বঙ্গোপসাগর যেহেতু বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত, কাজেই ঘূর্ণিঝড়টি দক্ষিণ দিক থেকেই আসে। হাজার মাইল দক্ষিণে নিম্নচাপ থেকে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়টি দক্ষিণ দিক থেকে এসে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। আবার কোনো কোনো সময় দিক পরিবর্তন করে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে।

Tidal Surge

জলোচ্ছ্বাস

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে জলোচ্ছ্বাসের সম্পর্ক থাকেই। ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে জলোচ্ছ্বাস হলে জানমালের ক্ষতি বেশি হয়। যেখানে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় সেই ঘূর্ণিঝড়-কেন্দ্র বা চক্ষু এলাকায় বাতাসের চাপ কম থাকে। ফলে ঘূর্ণিঝড়-কেন্দ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে সমুদ্রের পানি ফুঁসে ওঠে, একেই জলোচ্ছ্বাস বলে। ঝড়ে সমুদ্রের বুকে যে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে জোয়ারের পানি বৃদ্ধি পেয়ে সমুদ্র উপকূলে আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড়ের তীব্র বাতাসে সৃষ্ট সমুদ্রের ঢেউ স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে অনেক বেশি হয়। আর তা যদি অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময় হয়, তাহলে এ জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা আর অনেক বেশি হয়ে ভয়ংকর রূপ

ধারণ করে। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের ঢেউ ৪৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে দেখা গেছে। জলোচ্ছ্বাসের এই বিশাল ঢেউ উপকূলের ঘরবাড়ি, মানুষজন, পশুপাখি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মারা পড়ে হাজার হাজার মানুষ আর পশুপাখি।

সমুদ্রবন্দরের জন্য পুনর্বিন্যস্ত সংকেত

দূরবর্তী সতর্ক সংকেত-১ : এ সময় বাতাসের গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ৫১-৬১ কিলোমিটার। এটি দূরবর্তী সমুদ্রের জন্য প্রযোজ্য হবে। এটি মূলত দূরে গভীর সাগরে ঝোড়ো হাওয়ার যে অঞ্চলে রয়েছে, যেখানের বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৬১ কিলোমিটার এবং তা সামুদ্রিক ঝড়ে পরিণত হতে পারে। এর ফলে বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার পরে জাহাজটি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সম্মুখীন হতে পারে, সংশ্লিষ্টদের যে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এ সতর্ক সংকেতটি নদীবন্দরের জন্য প্রযোজ্য নয়।

দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত-২ : এ সময় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার। এটি মূলত ১ নম্বর দূরবর্তী সতর্ক সংকেতের মতো দূরবর্তী সমুদ্রের জন্য প্রযোজ্য। দূরে গভীর সাগরে ঝড় সৃষ্টি হয়েছে যেখানকার বাতাসের একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার। এর ফলে বন্দর এখনই ঝড়ে কবলিত হবে না। তবে বন্দর ত্যাগকারী জাহাজপথের মাঝে ঝোড়ো হাওয়ায় পড়তে পারে। এ সময় মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারগুলোকে উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে হবে, যাতে স্বল্প সময়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারে। এ সতর্ক সংকেতটি নদীবন্দরের জন্য প্রযোজ্য নয়।

স্থানীয় সতর্ক সংকেত-৩ : এটি সমুদ্রবন্দর উপকূলীয় অঞ্চল ও নদী বন্দরের জন্য প্রযোজ্য হবে। এর ফলে বন্দর ও বন্দরের আশপাশের এলাকায় ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগের ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। ঝোড়ো হাওয়ার কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগরে এবং নদীতে চলাচলকারী ৬৫ ফুট এবং এর কম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নৌযানগুলোকে অতি সত্বর নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে।

স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত-৪ : এটি সমুদ্রবন্দর ও উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য হবে। এর ফলে বন্দর ও আশপাশের এলাকা ঘূর্ণিঝড়কবলিত। বাতাসের সম্ভাব্য গতিবেগ ঘণ্টায় ৫১-৬১ কিলোমিটার। ঘূর্ণিঝড়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়ার মতো বিপজ্জনক সময় এখনো আসেনি। ১৫০ ফুট এবং এর কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট যেসব নৌযান ঘণ্টায় ৬১ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত ঝড়ো হাওয়া প্রতিরোধে সক্ষম নয়, সেসব নৌযানকে অনতিবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে।

- ৪ নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত দেখানোর পর খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সারা দেশে করণীয় সম্পর্কে এ সভা দিকনির্দেশনা দেবে। ৪ নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত দেখানোর পর থেকেই সংশ্লিষ্ট জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো সভায়

মিলিত হবে এবং তাদের এলাকার কথা হুঁশিয়ারি সংকেতে উল্লেখ থাকলে দুর্যোগ মোকাবিলায় সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ সময় থেকে গণদুর্যোগবার্তা প্রচারেরও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

- একটি কথা মনে রাখতে হবে, সমুদ্রবন্দরের জন্য স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত-৪ মানে ঘূর্ণিঝড়কেন্দ্রিক ভয়াবহ ধরনের ঝড়ের পূর্বাভাস, যা উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের এক বিশাল অংশে আঘাত হানতে পারে।

কিন্তু নদীবন্দরের জন্য স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত-৪-এর অর্থ মূলত নির্দিষ্ট এলাকায় অস্থায়ী ঝড় ও কালবৈশাখী-সংক্রান্ত পূর্বাভাস, যা সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা এবং দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরসহ দেশের যেকোনো এলাকায় আঘাত হানতে পারে। সুতরাং সামুদ্রিক ঝড়ের জন্য প্রযোজ্য স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত-৪ সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থা ও অস্থায়ী ঝড় ও কালবৈশাখীর জন্য প্রযোজ্য স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত-৪ দেখানোর পর গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অস্থায়ী ঝড় ও কালবৈশাখীর জন্য প্রযোজ্য স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত-৪ দেখানো হলে যেসব এলাকা উল্লেখ করা হবে, শুধু সেসব এলাকায় সতর্কতামূলক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন বোর্ডের সভা আহ্বানের প্রয়োজন হবে না এবং গণদুর্যোগবার্তা প্রচার করা হবে না।

বিপদসংকেত-৬ : এ সময় মাঝারি তীব্রতাসম্পন্ন সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মাঝারি ঝোড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে। এ সময় ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে এবং নদীতে চলাচলকারী সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

মহাবিপদসংকেত-৮ : এ সময় প্রচণ্ড তীব্রতাসম্পন্ন সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দরে অতি তীব্র ঝোড়ো হাওয়া বিরাজ করবে। প্রচণ্ড এ ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ থেকে ১১৭ কিলোমিটার হতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং নদীতে চলাচলকারী সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

মহাবিপদসংকেত-৯ : এটি প্রচণ্ড তীব্রতাসম্পন্ন একটি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়, যার কারণে বন্দর এলাকা এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অতি তীব্র ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে। হ্যারিকেনের তীব্রতাসম্পন্ন প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১১৮-১৭০ কিলোমিটার হতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে এবং নদীতে চলাচলকারী সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

মহাবিপদসংকেত-১০ : এ সময় অতি প্রচণ্ড তীব্রতাবিশিষ্ট বা সুপার সাইক্লোনের তীব্রতাবিশিষ্ট প্রচণ্ডতম একটি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দর এলাকায় অতীব তীব্র

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঝোড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে। সর্বোচ্চ তীব্রতাবিশিষ্ট এ ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১৭১ কিলোমিটার বা আরো বেশি হতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগরের সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

নদীবন্দরের জন্য পুনর্বিন্যস্ত সংকেত

সরকার-অনুমোদিত নতুন পদ্ধতিতে নদীবন্দরের জন্য মোট ছয়টি সংকেত চালু থাকবে। প্রথমটি হবে স্থানীয় সতর্ক সংকেত-০৩ এবং দ্বিতীয়টি হবে স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত-০৪। এরপর সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে মিল রেখে বিপদসংকেত-০৬ এবং মহাবিপদসংকেত-০৮, ০৯ এবং ১০ প্রবর্তন করা হয়েছে। নতুন পদ্ধতিতে বিপদসংকেত ০৫ ও ০৭ থাকছে না। উল্লেখ্য, নতুন পদ্ধতিতে নদীবন্দরের জন্য শীতকালে কুয়াশা ও বর্ষাকালে অতিবৃষ্টির জন্য দৃষ্টিগ্রাহ্যতা কমে গেলে নৌপরিচালনার জন্য এমন সতর্ক সংকেত ঘোষণা করা হবে, যাতে সাবধানে চলাচলের নির্দেশনা থাকবে।

DISASTER
দুর্যোগ

Hazard
আপদ

আপদ একটি অস্বাভাবিক ঘটনা, যা প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট কারিগরি ত্রুটির কারণে ঘটতে পারে এবং যা মানুষের জীবন ও জীবিকার ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে পারে।

প্রাকৃতিক—সাইক্লোন, বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি, খরা, নদীভাঙন

মানবসৃষ্ট—ভবনধস, নৌদুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, সড়ক দুর্ঘটনা

কারিগরি—পারমাণবিক দুর্ঘটনা

'আপদ দুর্যোগ নয়, বরং দুর্যোগের সম্ভাব্য কারণ'

ভূমিকম্প একটি আপদ, এর কারণে প্রাণহানিসহ অন্যান্য অবকাঠামো ধ্বংসের মাধ্যমে দুর্যোগ দেখা দিতে পারে। মৃদু ভূকম্পন আপদ কিন্তু এতে দুর্যোগ দেখা দেয় না।

আপদের বৈশিষ্ট্য

অধিকাংশ আপদ বর্ণনা করতে নিম্নবর্ণিত পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে :

- তীব্রতা (কত বড়, কত দ্রুত, কত শক্তিশালী)
- সম্ভাব্যতা (আপদ ঘটার আশঙ্কা)

- বিস্তৃতি (যে ভৌগোলিক ও সামাজিক এলাকায় একটি আপদ আক্রমণ করতে পারে)
- সময়সীমা (সতর্কতার সময়কাল, স্থায়িত্ব, দিন/সপ্তাহ/বছরের কোনো সময়)
- ব্যবস্থাপনা (কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে)

Biological Hazard
জৈবিক আপদ

মানুষ, শস্য এবং গৃহপালিত পশু-পাখির মাধ্যমে যে রোগগুলো উৎপন্ন হয় অথবা ছড়ায় তার ফলে যে আপদ সৃষ্টি হয় তাকে Biological Hazard বা জৈবিক আপদ বলে।

Geological Hazard
ভূতাত্ত্বিক আপদ

অভ্যন্তরীণ ভূমি প্রক্রিয়ার টেকটনিক (Tectonic) উৎপত্তির ফলে যথাক্রমে—ভূমিকম্প (Earthquakes), সুনামি (Tsunamis) এবং অগ্ন্যুৎপাত, পুঞ্জীভূত গতি, ধস, শিলাপাত ইত্যাদির সমন্বয়ে যে আপদ সৃষ্টি হয় তাকে Geological Hazard বা ভূতাত্ত্বিক আপদ বলে।

Hydro Meteorological Hazard

আন্তঃবাৎসরিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠী প্রভাবিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনগুলো এত বেশি হচ্ছে যা আন্তঃবাৎসরিক টাইমস্কেলের তাপমাত্রাকে প্রভাবিত করে। এই আঞ্চলিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে যে আপদের সৃষ্টি হয় তাকে Hydro Meteorological Hazard বলে। যেমন—বন্যা, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, প্রচণ্ড বেগে বাতাস প্রবাহিত হওয়া, ঝড়বৃষ্টি, বিজলি চমকানো, অনাবৃষ্টি, খরা, অগ্নিকাণ্ড, উচ্চ তাপমাত্রা, ধূলিঝড় ইত্যাদি।

Chronic Hazard
তীব্র আপদ

সমুদ্র উপকূলবর্তী বালির স্তূপ এবং তীরের ক্ষয়, সমুদ্র তীরবর্তী আবহাওয়ার ক্রমাগত পরিবর্তন ও নিচু ভূমিতে জলস্রোতের প্রবাহের ফলে যে স্থায়ী আপদের সৃষ্টি হয় তাকে Chronic Hazard বলে।

Technological Hazard
প্রযুক্তিগত আপদ

প্রযুক্তিগত বা শিল্প-দুর্ঘটনা বা মানুষের কর্মকাণ্ড, যা জীবন হারানোর কারণ, সম্পদের

ক্ষতি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নকরণ বা পরিবেশের অবনতির জন্য যে আপদের সৃষ্টি হয় তাকে Technological Harard বা প্রযুক্তিগত আপদ বলে। যেমন, দূষিত শিল্পাঞ্চল, যানবাহন, শিল্প বা প্রযুক্তি দুর্ঘটনা।

Vulnerability
বিপদাপন্নতা

কোন জনগোষ্ঠীর (Community) বা তার অংশের (ব্যক্তি বা পরিবার) কোনো এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট আপদে আক্রান্ত বা সম্ভাবনা এবং ঐ আপদ সংঘটনের ফলে সমাজ ও ব্যক্তির জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাব্য মাত্রা।

Risk
ঝুঁকি

কোনো আপদ বা আপদসমূহ, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী ও তার আয়, সম্পদ এবং পরিবেশ—এই তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রণের ফলে (Interaction) ক্ষতিকর প্রভাবের সম্ভাবনা। অর্থাৎ সহজে বললে কোনো আপদ ঘটার সম্ভাবনা ও মাত্রা এবং তার ফলে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষতির সম্ভাবনা এই দুয়ের পারস্পরিকতাই ঝুঁকি।

ঝুঁকি = আপদের সম্ভাবনা x বিপদাপন্নতা

বিপদাপন্নতা = ক্ষতির সম্ভাবনা/সমাজের সামর্থ্য

DISASTER MANAGEMENT
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

Disaster Risk Management
দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। এখানে দুর্যোগের আগে ঝুঁকি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিপদাপন্নতা কমানোর জন্য পূর্বপ্রস্তুতি-বিষয়ক কার্যাবলি গ্রহণ করা হয়, যাতে ভবিষ্যতে দুর্যোগের মারাত্মক প্রভাব রোধ করা সম্ভব হয়। সুতরাং দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বিপদাপন্নতা হ্রাস ও সামর্থ্য ও সক্ষমতা বাড়ানো।

দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপাদানগুলোর হচ্ছে—

১. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ২. প্রশমন ৩. প্রস্তুতি

DISASTER PREPAREDNESS
দুর্যোগ প্রস্তুতি

Disaster Preparedness
দুর্যোগ-প্রস্তুতি

দুর্যোগ ঘটার আগেই দুর্যোগের আশঙ্কা করে অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষ পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করাকে দুর্যোগ-প্রস্তুতি বোঝায়। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, দুর্যোগ-প্রস্তুতি হচ্ছে এমন কিছু পদক্ষেপ/কর্মসূচি/কাজ, যেখানে কোনো দুর্ঘটনার ভয়াবহতা সচেতনভাবে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে মানসিক, শারীরিক, সাংগঠনিক, আর্থিক ও প্রশাসনিকভাবে সতর্কতার সঙ্গে তৈরি থাকা। দুর্যোগ-প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ দুটি অংশ—প্রথমত, পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয়ত, প্রস্তুত থাকা। যেকোনো দুর্যোগে জীবন রক্ষা ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার লক্ষ্যেই এই পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। সাধারণত পরিকল্পনা হচ্ছে সম্পদ ও সময়ের সঠিক ব্যবহার। দুর্যোগের ক্ষেত্রেও অনুরূপ। শুধু তফাত এই যে এখানে শিথিলতা কম। কারণ আমাদের সম্পদ সীমিত আর সময় অল্প। প্রস্তুতি হচ্ছে এমন কিছু করণীয়, যা দুর্যোগ আসার আগেই করতে হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি বা পরিবার তার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। তার সেই প্রস্তুতিকে বেগবান ও চালু রাখতে সহায়তা করে সংগঠন। যেসব বিষয়ে ব্যক্তি বা পরিবারের পক্ষে প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয় না, সেসব ক্ষেত্রে সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুতির চেষ্টা করা হয়। ব্যক্তি, পরিবার ও সংগঠন-পর্যায়ের প্রস্তুতিমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। ভৌগোলিক অবস্থান এবং অন্যান্য কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা অত্যন্ত বিপদাপন্ন। প্রায় প্রতিবছরই এ দেশে কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটছেই। যেহেতু অধিকাংশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, তাই শুধু সম্ভাব্য দুর্যোগের কথা বিবেচনা করে আগে থেকেই বিশেষ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা যায়। দুর্যোগ-প্রস্তুতির মাধ্যমে মানুষের দুর্যোগ সহনশীলতা এবং ক্ষয়ক্ষতি বা ঝুঁকি প্রতিরোধের ক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

দুর্যোগ-প্রস্তুতি পরিকল্পনায় যেসব বিষয় লক্ষ রাখতে হয় তা হলো : দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ (অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে), দুর্যোগ সম্পর্কে সতর্কীকরণ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা, অনুসন্ধান, উদ্ধারব্যবস্থা, জীবন রক্ষা ও কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা, জরুরি ওষুধ ও খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা, অস্থায়ী আশ্রয়স্থল ও এর ব্যবস্থাপনা, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের পরিকল্পনা। দুর্যোগের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সম্ভাব্য দুর্যোগের বিভিন্ন বিষয় বা দিক বিবেচনা করা হয়। প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো–কখন দুর্যোগ হতে পারে, দুর্যোগ কোথায় আঘাত হানতে পারে, কী ধরনের দুর্যোগ কী

ধরনের আঘাত হানতে পারে, সে আঘাতের প্রচণ্ডতা কী হবে, কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে, ফলাফল কী হতে পারে, কারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে করণীয় কী, প্রস্তুতির সময়কাল কী বা কখন প্রস্তুতির প্রয়োজন, কে বা কারা প্রস্তুতি নেবে (ব্যক্তি/সমাজ/সংগঠন), প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচিতে কারা অংশ নেবে, ক্ষতিগ্রস্তদের কী ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা প্রয়োজন হতে পারে, স্থানীয়ভাবে কী সাহায্য-সহযোগিতা দেওয়া যাবে, বাইরের কী সাহায্য-সহযোগিতা দরকার হতে পারে, সাংগঠনিক কী সহায়তা দেওয়া যেতে পারে, সাংগঠনিক তৎপরতায় জনগণ কীভাবে অংশ নিতে পারে প্রভৃতি।

EARTHQUAKE
ভূমিকম্প

Earthquake
ভূমিকম্প

ভূ-আলোড়নের ফলে ভূপৃষ্ঠের কোনো কোনো অংশে আকস্মিক কম্পনের সৃষ্টি হলে তাকে Earthquake বা ভূমিকম্প বলে। ভূ-অভ্যন্তরস্থ শিলার স্থিতিস্থাপক ভারসাম্য নষ্ট হলে ভূত্বকের বিচ্যুতির মাধ্যমে নিঃসরিত স্থিতি বিনষ্টকারী শক্তির দ্বারা এই কম্পনের উৎপত্তি হয়। এরূপ কম্পন প্রচণ্ড, মাঝারি বা মৃদু আকারের হতে পারে। পৃথিবীতে গড়ে বছরে প্রায় ছয় হাজার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। অবশ্য এর বেশিরভাগই মৃদু আকারের হয় বিধায় সাধারণভাবে তা অনুভূত হয় না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে একটি মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প থেকে যে শক্তি নির্গত হয় তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমায় যে প্রথম পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল তার প্রায় ১০ হাজার গুণ বেশি। ভূমিকম্প-বিশারদ ও ভূবিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের বিভিন্ন উৎস বা কারণ নির্ধারণ করেছেন। তার মধ্যে নিম্নোক্তগুলো প্রধান :

ক. টেকটোনিক প্লেটের বিচলন ও পারস্পরিক ক্রিয়াজনিত অকস্মাৎ আন্দোলন বা টেকটোনিক ভূমিকম্প

খ. অগ্ন্যুৎপাত বা আগ্নেয়গিরিজনিত ভূমিকম্প

গ. মানব কর্মকাণ্ডঘটিত ভূমিকম্প

পৃথিবীর বেশিরভাগ ভূমিকম্প ভূখণ্ডীয় আন্দোলনের (Plate Tectonic) সঙ্গে জড়িত। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় উর্ধ্বমুখী উত্তপ্ত লাভা ও শিলারাশির চাপে নিকটবর্তী স্থানে ভূমিকম্প হয়। আবার ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো বিস্ফারণ ঘটানোও ভূমিকম্পের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ভূগর্ভস্থ যে স্থান থেকে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় তাকে কেন্দ্র বলে। ভূকম্পনকেন্দ সাধারণত ভূত্বকের ৬ থেকে ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করে। কেন্দ্র থেকে লম্বালম্বি ভূত্বকের উপরিস্থ বিন্দুকে উপকেন্দ্র (Epicenter) বলে। ভূমিকম্পের স্পন্দন উৎস থেকে তরঙ্গের মতো চারিদিকে প্রসারিত হয়। Seismograph (সাইসমেগ্রাফ) বা ভূকম্পনলিখন যন্ত্রের সাহায্যে এরূপ তরঙ্গ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

ভূমিকম্পের মাত্রা দুভাবে নির্ধারণ করা হয়, যথা :

1. Magnitude (তীব্রতা)
ভূমিকম্পের তীব্রতা সাধারণত রিখটার স্কেলে মাপা হয় (১-১০)। কোনো কোনো ভূকম্পন বিশারদ ৮ ও ততোধিক স্কেলের ভূমিকম্পকে অত্যন্ত ভয়াবহ (Great), ৭ থেকে ৭.৯ ভূমিকম্পকে মেজর (Major) এবং ৬ থেকে ৬.৯ স্কেলের ভূমিকম্পকে ব্যাপক (Large) বলে অভিহিত করে থাকেন। ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার সময়ই ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপা হয়। উল্লেখ্য, রিখটার স্কেলের মাত্রা ১ বৃদ্ধি পেলে ভূকম্পনের শক্তি ৩১.৬-এর বেশি গুণ বেড়ে যায়।

2. Intensity (ব্যাপকতা)
ভূমিকম্পের ব্যাপকতা সাধারণত সংশোধিত মার্কেলি স্কেলে মাপা হয় এবং রোমান সংখ্যায় প্রকাশ করা হয় (I থেকে XII পর্যন্ত)। Intensity ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা নির্দেশ করে এবং ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার পর তা মাপা হয়। প্রচণ্ডতার দিকে লক্ষ রেখে ভূমিকম্পের ব্যাপকতাকে Villent বা ভয়াবহ, Severe বা প্রচণ্ড, Moderate বা মাঝারি, Mild বা মৃদু ইত্যাদিতে আখ্যায়িত করা হয়।

Fault
চ্যুতি

ভূ-আন্দোলনের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের কোনো লাইন বরাবর একটি শিলাস্তর থেকে পার্শ্ববর্তী শিলাস্তরের স্থানচ্যুতি ঘটলে তাকে চ্যুতি বলে। ভূ-আন্দোলনের দিক অনুযায়ী উলম্ব বা আনুভূমিক দুভাবে চ্যুতি সংঘটিত হতে পারে।

Fault Plane
চ্যুতি তল

যে ভিত্তিভূমি বা রেখা হতে চ্যুতি সৃষ্টি হয়, তাকে চ্যুতি তল বলে।

Richter Scale
রিখটার স্কেল
এটি ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপক স্কেল বা মাপনি। ১৯৩৫ সালে ভূবিজ্ঞানী C. K. F. Richter এই স্কেলের প্রবর্তন করেন। এটি ১২টি এককবিশিষ্ট এবং প্রতিটি এককে নির্দিষ্ট মাত্রার ভূমিকম্প এবং এর ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতার সম্ভাব্য অবস্থা বর্ণনা করা আছে। এই স্কেলে প্রথম এককের মান হলো ১ থেকে ৩ এবং ১২তম বা সর্বোচ্চ মাত্রার ভূমিকম্পের মান হলো ৮.২ থেকে ১০। রিখটার স্কেলের ১০ হলো প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প বা সর্বোচ্চ তীব্রতাসম্পন্ন ভূমিকম্প।

Focal Depth
কেন্দ্রীয় গভীরতা
কেন্দ্রীয় গভীরতা বলতে ভূমিকম্পের উৎসকেন্দ্রের গভীরতাকে বোঝায়।

Epicenter
উপকেন্দ্র
ভূ-অভ্যন্তরে ভূকম্পন উৎসকেন্দ্রের লম্বালম্বি ওপরে ভূপৃষ্ঠের ছেদবিন্দুকে উপকেন্দ্র বলে। ভূপৃষ্ঠের এই স্থানে কম্পনের বেগ সর্বাপেক্ষা বেশি অনুভূত হয়।

Seismograph
এটি একটি মাপনি যন্ত্র, যার সাহায্যে ভূকম্পনের তরঙ্গগুলোর গতি ও প্রকৃতি গৃহীত হয়। এভাবে ভূকম্পলেখে সংগৃহীত বিভিন্ন প্রকার তরঙ্গের গতিবিধির পারস্পরিক বিশ্লেষণ করে ভূকম্পনের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায়। অত্যাধুনিক সূক্ষ্ম ভূকম্পলেখের মাধ্যমে হাজার মাইল দূরে অনুষ্ঠিত মৃদু ভূকম্পনের স্পন্দনও ধরা পড়ে।

Seismogram
সিসমোগ্রাম
সিসমোগ্রাফে ধারণকৃত রেকর্ডকে সিসমোগ্রাম বলা হয়। ভূমিকম্পের অবস্থান ও তীব্রতা নির্ণয়ে এই সিসমোগ্রাম ব্যবহার করা হয়। সিসমোগ্রাম প্রকৃতপক্ষে সিসমোমিটার নামক সিসমোগ্রাফের একটি চলনশীল অভ্যন্তরীণ অংশের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়।

Seismic Wave
ভূকম্পন ঢেউ
ভূকম্পন ঢেউ সাধারণত কোনো একটি ভূমিকম্প বা বিস্ফোরণের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এগুলো ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বা ভূ-অভ্যন্তরে বিচরণ করে।

Seismicyty

ভূমিকম্পনগুলোর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বণ্টনকে সিসমিসিটি বলে।

Seismic Point

ভূকম্পন কেন্দ্র

ভূ-অভ্যন্তরে যে উৎস থেকে ভূমিকম্পের সূত্রপাত হয় তাকে ভূকম্পন কেন্দ্র বলে। এই কেন্দ্র থেকে কম্পন তরঙ্গকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে অনুমান করা হচ্ছে যে, ভূমিকম্প কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে নয়, বরং একটি রেখা বরাবর সূত্রপাত হয়ে থাকে।

Mainshock

মূল অভিঘাত

যখন স্বল্প ফোকাল গভীরতাবিশিষ্ট বেশ কয়েকটি ভূমিকম্প সীমিত সময়ের ও স্থানে মধ্যে ক্রমানুসারে সংঘটিত হয় এবং এগুলোর মাঝে কোনো একটি যদি অন্যান্যগুলোর তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী হয়, তবে এই ভূমিকম্পটিকে মূল অভিঘাত বলা হয়। মূল ভূমিকম্পের আগে সংঘটিত ভূমিকম্পগুলোকে অনুবর্তী-অভিঘাত নামে অভিহিত করা হয়। তবে, মূল অভিঘাত ছাড়া ক্রমানুসারে বেশ কয়েকটি ভূকম্পন সংঘটিত হলে, একে ভূমিকম্প পুঞ্জ বলা হয়।

Plate Tectonic

প্লেট টেকটোনিক

ভূতাত্ত্বিক মতবাদ অনুসারে ভূত্বক প্রধানত সাতটি বড় ও কয়েকটি ক্ষুদ্র গতিশীল কঠিন প্লেট দ্বারা গঠিত, যেগুলো নিম্নস্থ ভ্রাম্যমাণ উষ্ণ গুরুমণ্ডলীয় পদার্থের ওপর ভাসছে। প্লেটের বিচলন (Movement) ও পারস্পরিক ক্রিয়া ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, পর্বত সৃষ্টি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ভূতাত্ত্বিক ঘটনাবলির নিয়ন্ত্রক বলে ধারণা করা হয়। তিন ধরনের পারস্পরিক প্লেট সীমানার কথা জানা যায়। যথা—সমকেন্দ্রাভিমুখী সীমা (Convergent Plate Boundary), অপসারী সীমা (Divergent Plate Boundary) এবং পরিবর্তন চ্যুতি সীমা (Transverse Plate Boundary) ।

সমকেন্দ্রাভিমুখী সীমা : যখন একে অপরের দিকে অগ্রসরমাণ দুটি প্লেট কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে অবশেষে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন একটি প্লেট অপরটির নিচে চাপা পড়ে। এই ধরনের প্লেট সংঘর্ষের ফলে পর্বতমালার সৃষ্টি হয় এবং প্লেট প্রান্তিকের আশপাশে আগ্নেয়গিরির কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়।

অপসারী সীমা : এই ক্ষেত্রে দুটি প্লেট একে অপরের থেকে সরে যেতে থাকে। এই ধরনের প্লেট সীমানার ফলে নতুন সমুদ্র তলদেশের এবং সামুদ্রিক আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়।

পরিবর্তন চ্যুতি সীমা : যখন দুটি প্লেট একে অপরকে অতিক্রম করে যায়, তখন তাকে পরিবর্তন চ্যুতিসীমা বলে। তিন ধরনের প্লেট বিচলনেই ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

বঙ্গীয় অববাহিকার অধিকাংশই পড়েছে বাংলাদেশে, যা ভারতীয় প্লেট ও এশীয় প্লেটের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে উৎপত্তি হয়েছে। ক্রিটেসিয়াস যুগের আগে (সাড়ে ১২ কোটি বছর আগে) বাংলাদেশের অংশবিশেষসহ (বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চল) ভারতীয় প্লেট, অ্যান্টার্কটিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে গন্ডোয়ানাল্যান্ড নামে একটি বৃহৎ মহাদেশ গড়ে তোলে। বাংলাদেশের অবশিষ্টাংশের তখন অস্তিত্ব ছিল না। অতঃপর গন্ডোয়ানাল্যান্ডের ভাঙনের ফলে ভারতীয় প্লেটের উত্তরমুখী সঞ্চরণ ও সর্বশেষ এশীয় প্লেটের সঙ্গে এর সংঘর্ষের ফলে হিমালয় পর্বতমালা ও বাংলাদেশের বদ্বীপীয় সমভূমির সৃষ্টি হয়। ভারতীয় প্লেট ও এশীয় প্লেটের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক সংঘর্ষ ইয়োসিন যুগে (৫ কোটি থেকে সাড়ে ৫ কোটি বছর আগে) হিমালয়ের প্রারম্ভিক উত্থানের সময় প্রথম সংঘটিত হয়। নিন ইয়োসিন যুগে (সাড়ে ৩ কোটি থেকে ৪ কোটি বছর আগে) ভারতীয় প্লেট ও এশীয় প্লেট মধ্যবর্তী টেথিস সাগরের সর্বশেষ চিহ্ন বিলীন হয়ে যায়। এই সময়েই ভারতীয় প্লেটের অভিসরণ দিক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষসহ উত্তর থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ওলিগোসিন যুগ থেকে (সাড়ে তিন কোটি বছর আগে) প্লেট সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে এবং বিশাল নদীমালার জলরাশিতে দক্ষিণে আদি বঙ্গীয় অববাহিকা ভরে উঠলে উত্থিত হিমালয়ের অবক্ষেপণ নেমে আসতে শুরু করে। মায়োসিন পরবর্তী সময় থেকে (আড়াই কোটি বছর তৎপরবর্তী) অববাহিকায় দ্রুত অবনমনের সঙ্গে হিমালয় পর্বতমালার দ্রুত উত্থানে ফলে বিপুল অবক্ষেপণ স্তূপের পাশাপাশি বৃহদাকৃতির বদ্বীপ গড়ে ওঠে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ নামের এই সুবৃহৎ বদ্বীপের গঠনপ্রক্রিয়া আজও অব্যাহত রয়েছে। এদিকে ভারতীয় প্লেটের এশীয় প্লেটের নিচে অধোগমন হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলে একটি সন্ধিরেখা অঞ্চল সৃষ্টি করেছে আর পূর্বে ইন্দো-বার্মার পর্বতসারি পূর্বাঞ্চলীয় প্লেট সংঘর্ষের অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত। এশীয় প্লেটের সঙ্গে ভারতীয় প্লেটের সংঘর্ষ আজও অব্যাহত আছে। মাঝে মাঝেই প্লেট-সংলগ্ন অঞ্চলে ভূমিকম্প উপরিউক্ত কথাই প্রমাণ করে।

Seismic Zone

ভূকম্পন বলয়

ভূমিকম্প সংঘটনের ঐতিহাসিক উপাত্তের ভিত্তিতে কোনো অঞ্চলের ভূকম্পন-প্রবণতা প্রকাশ হচ্ছে ভূকম্পন বলয়। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে ঐ অঞ্চলে আরো ভূকম্পন সংঘটিত হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। একটি অঞ্চলের অতীত ভূকম্পন আচরণ নির্ণয় এব ভবিষ্যৎ প্রবণতা নির্ণয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সংঘটিত মৃদু ও বৃহৎ উভয় মাত্রার ভূকম্পনের সময়গত (Temporal) ও পরিসারিক বন্টনের রীতিবদ্ধ বর্ণনা অত্যাবশ্যক।

EMERGENCY RESPONSE
জরুরি সাড়া

Early Warning
পূর্বসতর্কতা

পূর্বসতর্কতা হলো যেকোনো দুর্যোগ আঘাত হানার আগেই ব্যক্তি বা জনগণের কাছে বার্তা প্রচার বা তথ্য প্রদান করা। পূর্বসতর্কতায় সাধারণত আপদগুলো, ঝুঁকি, ঝুঁকির উপাদান, পরিবেশ, বিপদের অস্তিত্ব এবং বিপদ প্রতিরোধ, বিপদ এড়াতে অথবা ক্ষয়ক্ষতি কমাতে কী করা যায় সে সম্বন্ধে তথ্য প্রচার করা হয়ে থাকে।

পূর্বসতর্কতা দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাসের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা জীবনহানি প্রতিরোধ করে এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি কমিয়ে আনে।

একটি সঠিক ও কার্যকরী পূর্বসতর্কতা-ব্যবস্থা চারটি ধারাবাহিক ধাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় :

১. ঝুঁকিসচেতনতা : জনগোষ্ঠী সম্ভাব্য যে ঝুঁকিগুলো মোকাবিলা করে সে সম্পর্কে ভালো একটি ধারণা থাকা।

২. পর্যবেক্ষণ ও সতর্কতা-ব্যবস্থা : এসব ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষমতা পর্যবেক্ষণ এবং পূর্বসতর্কতার জন্য দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৩. যোগাযোগ : সবার জন্য সহজে বোধগম্য সতর্ক সংকেত ও প্রস্তুতির তথ্য প্রচার করা।

৪. সাড়াদান সামর্থ্য : জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকর সহায়তা প্রদানের সক্ষমতা।

উপরিউক্ত ধাপগুলোর কোনো একটি সঠিকমতো সম্পন্ন না করলে পূর্বসতর্কতার পুরো শৃঙ্খলটাই ভেঙে যেতে পারে। পূর্বসতর্কতা যে নির্দেশনা দেয় তা হলো—কী করতে হবে, কেন করতে হবে, কখন করতে হবে, কীভাবে করতে হবে, কাকে করতে হবে, কোথায় করতে হবে।

Evacuation
স্থানান্তর করা

যারা জীবনের ঝুঁকিতে আছে তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসার প্রক্রিয়াই হলো স্থানান্তর করা। যখন আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা প্রচার করা হয়, তখন উপকূলীয় ও দ্বীপের জনগণকে নিরাপদ জায়গায় স্তানান্তর করা গুরুত্বপূর্ণ। প্রবল বন্যার সময় জনগণকে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসা জরুরি।

Search and Rescue

অনুসন্ধান ও উদ্ধার করা

দুর্যোগে আটকে পড়া ও হারিয়ে যাওয়া মানুষদের অনুসন্ধান ও মুক্ত করা প্রয়োজন। যেমন, ভূমিকম্পের পর অনেক মানুষ ধসে পড়া ভবনের নিচে আটকে পড়ে বা প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের সময় হারিয়ে যাওয়া জনগণ নিরাপদ আশ্রয়ে আসতে সক্ষম হয় না, তখন তাদের অনুসন্ধান ও উদ্ধার করার প্রয়োজন পড়ে।

Need and Loss Assessment

চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ

জরুরি সাড়ায় নিয়োজিত সংস্থাগুলো জরুরি অবস্থা নিরূপণ করে থাকে এবং সাড়া কার্যক্রম বাস্তবায়নের আগে তাদের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। একটি জরুরি সাড়া কার্যক্রম পরিচালিত হয় পরিস্থিতি মূল্যায়ন, উদ্দেশ্য নির্ধারণ, বিকল্প ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করা এবং উদ্দেশ্য ও বিকল্পের ওপর ভিত্তি করে সাড়া বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে।

দুর্যোগ মূল্যায়ন একটি চলমান ও আবর্তনমূলক/ঘূর্ণায়মাণ প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়। পরিস্থিতি, তথ্য-প্রাপ্যতা এবং জরুরি চাহিদা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। দুর্যোগের ধরন, প্রাপ্ত সম্পদ এবং নির্দিষ্ট তথ্যের চাহিদার ওপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই মূল্যায়ন করা হয়। সাধারণত যত দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন হয় তত দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। সাড়া প্রদানের ধরন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রাথমিক মূল্যায়ন দ্রুত ও খসড়া হতে পারে কিন্তু সময় এবং উপাত্ত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা চূড়ান্ত করা হয়। কার্যকর উদ্যোগ সব সময় নির্ভর করে দুর্গত এলাকায় কী পরিমাণ সম্পদ বিদ্যমান তার ওপর। এগুলোর অধিকাংশই একটি দুর্যোগের পরবর্তী ফলাফলের বিস্তারিত মূল্যায়নের জন্য। বাইরে থেকে বড় ধরনের সহায়তা পাওয়ার আগে স্থানীয় সম্পদ জানমাল রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে, ভূমিকম্পের অনুসন্ধান ও উদ্ধার এবং জরুরি চিকিৎসাসেবার জন্য সাড়া তাৎপর্যপূর্ণভাবে নির্ভর করে স্থানীয় সম্পদের ওপর।

Emergency Relief Activities

জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম

দুর্যোগে আক্রান্ত জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় দ্রব্য/উপকরণ (খাদ্য, বাসস্থান, পানি, পয়োনিষ্কাশন ইত্যাদি) পৌছানো জরুরি ত্রাণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। ত্রাণ সরবরাহ করার জন্য দুর্যোগের ধরন ও বিপদাপন্নতা চিহ্নিত করা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, ত্রাণ বিতরণে গর্ভবতী মহিলাদের অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজনের বিষয়টি লক্ষ রাখা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে শিশু খাদ্যের পর্যাপ্ততার বিষয়টিও। সব লোকজনকে এক জায়গায় জড়ো করার চেয়ে বৃদ্ধ বা প্রতিবন্ধী লোকজনের মধ্যে অন্যভাবে ত্রাণ বিতরণ করা যায় কি না

তা ভেবে দেখা। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থাগুলো নিয়ে একটি প্রকল্প কাজ সম্পন্ন করেছে। এই প্রকল্প ত্রাণসামগ্রীর গুণগত মান ও পরিমাণ বর্ণনা করে পুষ্টি ও প্রাপ্যতার ভিত্তিতে। এই প্রকল্প প্রাপ্ত সম্পদের ওপর নির্ভরশীল, যা পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন, পুষ্টি, খাদ্য-সহায়তা, আশ্রয় ও অবস্থান পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্যসেবার ন্যূনতম মান নির্ধারণ করে। এ মানগুলো পৃথিবীব্যাপী একই রকম। মানের ব্যবহার নির্ভর করে দেশের বিদ্যমান সম্পদের ওপর।

Emergency Situation
জরুরি অবস্থা

এটি এমন এক পরিস্থিতি, যা মোকাবিলায় জরুরি হস্তক্ষেপ বা জরুরি সহায়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। জরুরি অবস্থা ধনীদের তুলনায় দরিদ্র মানুষকে বেশি প্রভাবিত করে এবং এর ফলে অনেক মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ে। যখন স্থানীয় মোকাবিলা কৌশল ভেঙে পড়ে বা আক্রান্ত মানুষের সামর্থ্যের অভাব দেখা দেয় তখনই জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ENVIRONMENT
পরিবেশ

Environment
পরিবেশ

কোনো একটি জীবের অস্তিত্ব বা বিকাশের ওপর ক্রিয়াশীল সামগ্রিক পারিপার্শ্বিকতা, যেমন—চারপাশের ভৌত অবস্থা, জলবায়ু ও প্রভাব বিস্তারকারী অন্যান্য জীব ও জৈব উপাদানকে Environment (পরিবেশ) বলে। বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন পাস হয়েছে। কিন্তু জনবিস্ফোরণ, বনাঞ্চলের অবক্ষয় ও ঘাটতি এবং শিল্প ও পরিবহন নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার অভাবের দরুন দেশের পরিবেশ এক জটিল অবস্থার দিকে যাচ্ছে।

FLOOD
বন্যা/বান/প্লাবন

Monsoon Flood
মৌসুমি বন্যা

এই বন্যা ঋতুগত, বর্ষাকালে নদ-নদীর পানি ধীরে ধীরে ওঠানামা করে এবং বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
ভৌগোলিক তথ্যব্যবস্থা

Geographic Information System (GIS)
ভৌগোলিক তথ্যব্যবস্থা

ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থান-সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য গৃহীত প্রযুক্তিকে বলা হয় Geographic Information System (GIS) বা ভৌগোলিক তথ্যব্যবস্থা। যেসব খাতে স্থানিক সম্পর্কিত উপাত্ত, যেমন—জেলা, থানা অথবা কোনো একটি ভূখণ্ডের সীমানার সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য ও বিষয়াদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেসব খাতে জিআইএস প্রযুক্তি অত্যন্ত উপযোগী। বিশেষ করে, ভূমি ব্যবহার, আদমশুমারি, নগরপরিকল্পনা, বন, পরিবহন-ব্যবস্থাসহ আরো অনেক ক্ষেত্রে জিআইএস প্রযুক্তি আজকাল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আধুনিক জিআইএস প্রযুক্তির উন্নয়নে কানাডার ভূমিকা অগ্রগণ্য। কানাডার কৃষি পুনর্বাসন ও উন্নয়ন এজেন্সি (Agriculture Rehabilitation and Development Agency) ১৯৬৩ সালে কানাডা জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (সিজিআইএস) প্রযুক্তির প্রচলন করে। ১৯৯১ সালে ইসপান (Irrigation support project for Asia and the Near East) ফ্ল্যাড অ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ-১৯) প্রকল্পে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ জিআইএস ব্যবহার করে। ইসপান পরবর্তী সময়ে ইজিআইএস (Environmental and GIS Support Projects for Water Sector Planning) নামে পুনর্গঠিত হয়েছে। বর্তমানে দেশে ৫০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠানে জিআইএস স্থাপনা রয়েছে। শুরুর দিকে অধিকাংশ জিআইএস স্থাপনা ছিল অনুদান সহায়তা হিসেবে লাভ করা এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও সামান্যসংখ্যক স্থানীয় জনশক্তি দ্বারা পরিচালিত। বর্তমানে পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের নিজেদের অর্থায়নে জিআইএস ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং স্থানীয় জনশক্তি দ্বারা এসব ল্যাব পরিচালিত হচ্ছে।

POLLUTION
দূষণ

Environmental Pollution
পরিবেশ দূষণ

সাধারণত জীবনধারণের জন্য উপযোগী উপকরণ-পরিবেষ্টিত পরিমণ্ডলকে পরিবেশ বলে। পরিবেশের উপাদান হলো বায়ু, পানি, মাটি, আলো, শব্দ প্রভৃতি। এসব মাটি,

পানি, বায়ু তথ্য পরিবেশের কোনো উপাদান যখন এমন কোনো ভৌত, রাসায়নিক জৈবিক বা তেজস্ক্রিয় পরিবর্তন ঘটে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাৎক্ষণিক বা পরবর্তী সময়ে জীবজগতের ওপর নেতিবাচক বা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে বা ফেলতে পারে তখন ঐ অবস্থাকে পরিবেশ দূষণ বলে।

Sound Pollution
শব্দদূষণ

পরিবেশ শ্রুতিসীমা বা সহনক্ষমতা-বহির্ভূত অপেক্ষাকৃত উচ্চ তীব্রতা এবং তীক্ষ্নতাসম্পন্ন সুরবর্জিত শব্দের উপস্থিতিতে জীব-পরিবেশ তথা মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর যে অসংশোধনযোগ্য ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হয় সেই পরিবেশসংক্রান্ত ঘটনাকে শব্দদূষণ বলে। বাস, লরি এবং ট্রেনের হর্নের শব্দ, বিমান ওড়ার শব্দ, মেঘগর্জন কিংবা বজ্রপাতের শব্দ, মাইকের শব্দ ইত্যাদি সুরবর্জিত শব্দই শব্দদূষণের অন্যতম প্রধান কারণ।

RIVER
উপনদী

Tributary
উপনদী

বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপন্ন ছোট ছোট নদী যখন কোনো বড় নদীতে পতিত হয়, তখন সেসব ছোট নদীগুলোকে বড় নদীগুলোর উপনদী বলে। যেমন—তিস্তা, যমুনা নদীর উপনদী।

Confluence
নদীসঙ্গম

দুই বা ততোধিক নদীর মিলনস্থানকে নদীসঙ্গম বলে। যেমন, পদ্মা ও যমুনা গোয়ালন্দের কাছে মিলিত হয়ে নদীসঙ্গমের সৃষ্টি করেছে।

Sandy Land
চর

নদীর শেষ প্রবাহে সাধারণত বালুর চর সৃষ্টি হয়। এ সময় নদীরপ্রবাহ একবারে ক্ষীণ হয়ে আসে এবং পলি-বহনক্ষমতা প্রায় হারিয়ে ফেলে। ফলে নদীর তলদেশে পলি সঞ্চিত হতে শুরু করে এবং কালক্রমে নদীর বুকেই চরের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের যমুনা নদীতে প্রায়শই এ ধরনের চরের সৃষ্টি হয়। তবে বর্ষাকালে স্রোতের বেগ বৃদ্ধি পেলে এসব চর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

Cusec
কিউসেক

কোনো নদীর একটি নির্দিষ্ট স্থানে কী পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয় তা পরিমাপ করার জন্য পরিমাপের একক হিসেবে কিউসেক ব্যবহার করা হয়। প্রতি সেকেন্ডে কত ঘনফুট পানি প্রবাহিত হচ্ছে তা বোঝাতে কিউসেক পরিমাণ ব্যবহার করা হয়।

Course
নদীর গতিপথ

নদী যে পথে অগ্রসর হয় তাকে নদীর গতিপথ বলে।

Cut-off
ছিন্নবাঁক

সমভূমিতে নদী সর্পিল গতিতে তথা এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষয়কার্যের ফলে সর্পিল নদীর দুই বাঁক ক্রমান্বয়ে কাছাকাছি এসে পুরাতন পথ পরিত্যাগ করে নতুন গতিপথে সোজা প্রবাহিত হয় এবং পরিত্যক্ত নদী পথের দুই প্রান্ত তখন তলানি জমে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে ছিন্ন বাঁকের সৃষ্টি হয়।

ঝিল

ঝিল হলো নদীর পরিত্যক্ত পথ। আঞ্চলিক ভাষায় একে ঝিল নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণত ঝিলকে অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ হিসেবে নির্দেশ করা যায়। এটি দুটি উপায়ে সৃষ্টি হতে পারে : ১. যখন কোনো নদী তার পুরাতন গতিপথ পরিত্যাগ করে এবং পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে পলিসঞ্চিত হয়ে পুরাতন গতিপথের মুখ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে কালক্রমে এটি মূল নদী থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি বন্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়। ২. নদী যখন বাঁকা পথ পরিবর্তন করে সরল পথে প্রবাহিত হওয়ার প্রবণতা প্রদর্শন করে সে ক্ষেত্রে কাছাকাছি বাঁক দুটোর সুরপথ দুটি ক্ষয়কার্যের দরুন সংযুক্ত হয়ে যায় এবং নদী পুরাতন পথ পরিত্যাগ করে নতুন সরল পথে প্রবাহিত হয়।

নদীর মধ্য ও নিম্নগতিতে ক্ষয় ও সঞ্চয়ক্রিয়ার ফলে অশ্বখুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি হয়। ঝিলগুলো বেশিরভাগ দেখা যায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকায়। এগুলো বর্ষা মৌসুমে গভীরভাবে প্লাবিত হয় এবং সমৃদ্ধ মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। শুষ্ক মৌসুমে ঝিলগুলো কৃষি ও গবাদিপশুর চারণক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত উচ্চভূমি বরাবর এলাকা পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে জনবসতি দেখা যায় যা সাময়িকভাবে বন্যা প্রভাবমুক্ত। অব্যবহৃত উচ্চভূমির নিকটবর্তী ধীরগতিসম্পন্ন প্লাবন এলাকা কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রায় শুষ্ক ভূমির কিছু অংশ বোরো চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়।

RISK
ঝুঁকি

Risk
ঝুঁকি

প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কোনো আপদের কারণে জানমালের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাই হলো ঝুঁকি। ঝুঁকির সঙ্গে জড়িত আছে তিনটি বিষয়, তা হলো আপদ, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা। আবার ঝুঁকির মাত্রা নির্ভর করে ব্যক্তির বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার ওপর। আপদের ফলাফলকে মানুষ যদি তার সক্ষমতার সাহায্যে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তাহলে তার কাছে বিষয়টি আর ঝুঁকি থাকবে না।

একই দেশে একই মাত্রার আপদে বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার নিরিখে ধনী ও দরিদ্র ব্যক্তির মধ্যে ঝুঁকির তারতম্য হতে পারে। যেমন—কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া দ্বীপে একই সাইক্লোন একজন দরিদ্র ও একজন ধনী ব্যক্তির মধ্যে ঝুঁকির মাত্রা দুই রকম হবে। বিষয়টি একটি সমীকরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে :

ঝুঁকি = আপদ X বিপদাপন্নতা/সক্ষমতা।

এ ক্ষেত্রে সক্ষমতা ও বিপদাপন্নতার মান বসাতে হবে। ধরি, এগুলোর মান ১ থেকে ৫ পর্যন্ত। এখানে ১-এর মান সবচেয়ে কম এবং ৫ হলো সর্বোচ্চ। দরিদ্র ফুলবিবি, যার ঘরবাড়ি খুবই জীর্ণ এবং দুর্বল অবকাঠামো, সঞ্চয় নাই, অক্ষরজ্ঞানহীন এবং সামাজিক অবস্থা নিম্ন—তার বিপদাপন্নতা ৫ হলে ধনী রহিম মোল্লার বিপদাপন্নতা ১ হবে। কেননা তার আর্থিক অবস্থা ভালো, ঘরবাড়ি মজবুত, তিনি শিক্ষিত ও সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন। আবার সেই অনুযায়ী ফুলবিবির সক্ষমতা ১ এবং রহিম মোল্লার সক্ষমতা ৫। উভয় ক্ষেত্রেই আপদকে ৫ হিসেবে ধরা হচ্ছে (কেননা সব ক্ষেত্রেই দুর্যোগের মাত্রা একই হয়)।

সুতরাং রহিম মোল্লার ঝুঁকি = ৫ X ১/৫ = ১

ফুলবিবির ঝুঁকি = ৫ X ৫/১ = ২৫

অর্থাৎ আপদের মাত্রার ওপর নয় বরং বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার মাত্রার ওপরই মানুষের ঝুঁকি নির্ভর করে।

ঝুঁকি নিরূপণ হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি, যার দ্বারা সম্ভাব্য আপদের আশঙ্কা, প্রকৃতি ও বিস্তার নিরূপণ করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে বিপদাপন্নতার বর্তমান প্রকৃতিও নিরূপণ করা যায়, যা সম্ভাব্য আপদের আশঙ্কা সম্পর্কে ধারণা দেয়। যেমন, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন, সম্পদ, পরিবেশের ওপর সম্ভাব্য আপদ কতটুকু প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম ইত্যাদি ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে জানা যায়।

Risk Reduction
ঝুঁকি হ্রাস করা

ঝুঁকির পরিবেশ সম্পর্কে জানা ও তার ব্যবস্থাপনা করাই হলো ঝুঁকি হ্রাস। অর্থাৎ নিজেদের এমনভাবে প্রস্তুত করা, যেন যেকোনো দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনেক কমে আসে। ISDR কর্তৃক প্রকাশিত বইতে (Living with risk: a global review of disaster reduction initiatives) নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ডকে ঝুঁকি হ্রাসের আওতায় বিবেচনা করা হয়েছে—

- সম্ভাব্য ঝুঁকির ব্যাপারে ব্যাপক গণসচেতনতা এবং আপদ, ঝুঁকি, সক্ষমতা ও বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ।
- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং তথ্যপ্রবাহ বাড়ানোর মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ সাধন।
- কাঠামোগত ফ্রেমওয়ার্ক—যার মাধ্যমে নীতি, পলিসি, সাংগঠনিক ফ্রেমওয়ার্ক এবং এ বিষয়ে সরকারের দায়বদ্ধতা।
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সংরক্ষণ, সহযোগিতা ও নেটওয়ার্কিং বাড়ানো।
- আগাম সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা প্রবর্তন, যার মাধ্যমে সংকেত প্রচার ও প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড এবং কমিউনিটির সাড়া প্রদানের সক্ষমতা বাড়ানো বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দুর্যোগ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শব্দ

Agenda 21
অ্যাজেন্ডা ২১

১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জ্যানিরো শহরে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়ন-বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনে গৃহীত অন্যতম দলিল অ্যাজেন্ডা ২১। সারা বিশ্বের পরিবেশ সমস্যাগুলোকে বিষয়ভিত্তিকভাবে বিন্যস্ত করে সরকারি-বেসরকারি বা ব্যক্তি পর্যায়ে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক তার বর্ণনা রয়েছে এই দলিলে। বিশাল আকৃতির এ দলিলে আছে ৪ পর্বের ৪০টি অধ্যায়। প্রথম পর্বে প্রস্তাবনা, দ্বিতীয় পর্বে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা, তৃতীয় পর্বে মুখ্য গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা ও চতুর্থ পর্বে বাস্তবায়ন পদ্ধতি। অধিকাংশ অধ্যায়ে এই কর্মসূচিগুলো একাধিক কর্মক্ষেত্রের অধীনে বিন্যস্ত। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে প্রথমত রয়েছে তার যৌক্তিকতা বা ভিত্তি, দ্বিতীয়ত লক্ষ্য, তৃতীয়ত কর্মকাণ্ড

এবং সর্বশেষে বাস্তবায়ন পদ্ধতি। অ্যাজেন্ডা ২১ বাস্তবায়নের ব্যাপারটি পরিবীক্ষণের জন্য পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের অধীনে কমিশন অন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গঠন করা হয়েছে।

Barrage
বাঁধ

Barrage বা বাঁধ হলো একটি যান্ত্রিক কৌশল বা ব্যবস্থা, যার দ্বারগুলোর যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে নদীর পানি প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রবল বন্যার সময় অতিরিক্ত পানি নির্গমনের জন্য বাঁধের দ্বারগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। প্রয়োজনে পানি ধরে রাখা এবং নির্গমনের জন্য বাঁধের সঙ্গে দ্বার সংযুক্ত নির্গমন পথ থাকে। পানিপ্রবাহকে খালের মাধ্যমে ভিন্ন পথে পরিচালনার জন্যও বাঁধ নির্মাণ করা হয়ে থাকে। সাধারণত কংক্রিট (চুন, বালি, সুরকির মিশ্রণ) দ্বারা বাঁধ নির্মিত হয়, এর নির্গমনপথের দ্বার বা কপাটগুলো ইস্পাতনির্মিত। বাঁধে বিভিন্ন ধরনের কপাট ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে সাধারণ ধরনের কপাটগুলো উল্লম্বভাবে একটি নিয়ন্ত্রক কাঠামোর মধ্যে সহজে ওঠানামা করানো যায়। বাঁধগুলো এমনভাবে নির্মিত হয়ে থাকে, যাতে সহজে দ্বারগুলোকে খাড়াভাবে উঠিয়ে বাঁধের তলদেশে পানিপ্রবাহ বাধাহীন রাখা যায়। এ ছাড়াও খালের মধ্যে পানি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধের মূল নিয়ন্ত্রক পলি ও বন্যার পানি খালে প্রবেশ করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে। বাঁধের কাজের মধ্যে এ ছাড়াও প্রবল বন্যার পানি বিকল্প পথে মুক্ত করা, পলি নিয়ন্ত্রণে যান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জলাধার থেকে পলির স্তর নিষ্কাশন এবং মাছ চলাচলের পথ বাধাহীন রাখা উল্লেখযোগ্য।

El-Nino
এল-নিনো

এল-নিনো প্রকৃতপক্ষে মহাসাগরীয় অঞ্চলের একটি ঘটনা। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু উপকূল থেকে প্রবাহিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়া প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর ঘন আস্তরণ বিস্তার করে আছে। আবহাওয়াবিদগণ একে চিহ্নিত করেছেন এল-নিনো নামে। এল-নিনো একটি স্প্যানিশ শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে যিশু শিশু। সাধারণত ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের সময়ে এর উৎপত্তি হয়ে থাকে বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এল-নিনোর প্রভাবে মহাসাগরীয় অঞ্চলের তাপমাত্রা ৪-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, গড়ে প্রতি সাত বছর পরপর এল-নিনোর আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু ১৯৯০ সালের পর থেকে এল-নিনো আবির্ভূত হচ্ছে একটার পর একটা। ১৯৯৫-৯৬ সালের পর আবার ১৯৯৭-৯৮ সালে এল-নিনো আবির্ভূত হয়েছে। ১৯৯৭ সাল ছিল এল-নিনো বর্ষ। ১৯৮২ সালের এল-নিনোকে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ এল-নিনো বলা হয়। এই এল-নিনোর প্রভাবে আনুমানিক ২০০০ অমূল্য জীবন ঝরে গেছে এবং তিন বিলিয়ন ডলারের সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। বাংলাদেশের

প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোকে এল-নিনোর প্রভাব বলে বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন। বিজ্ঞানীরা বাংলাদেশের ১৯৮৮ সালের বন্যা, ১৯৯৭ সালের নজিরবিহীন শৈত্যপ্রবাহ, ১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকরী ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যাকে এল-নিনোর প্রভাবের কারণে বলে অভিহিত করছেন। তবে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা ১৯৫৭, ১৯৭২ ও ১৯৮২ সালকে বাংলাদেশের জন্য এল-নিনো বর্ষ হিসেবে গণ্য করেন।

Ecosystem
প্রতিবেশ

সাধারণত জীবজগৎ এবং তাদের স্বাভাবিক আবাসই হলো Ecosystem। কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসরত জীবসম্প্রদায়ের বিভিন্ন সদস্যের সঙ্গে ঐ স্থানের জড় উপাদানগুলোর সব সদস্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে অনুকূল বসবাসরীতি গড়ে ওঠে তাকে Ecosystem বলে। অন্যভাবে বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী জীবগোষ্ঠী, তাদের পরিবেশ ও জীবগোষ্ঠী ও পরিবেশের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন জালিকাকার গঠনকেই Ecosystem বলা হয়। বিজ্ঞানী ট্যানসলে বলেছেন, 'একটি জীবগোষ্ঠী এবং তাদের ভৌত পরিবেশ যখন আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে একটি বাস্তুসংস্থানগত একক হিসেবে কাজ করে তখন তাকে Ecosystem বলে। এ বাস্তুতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বা নির্দিষ্ট এককের মধ্যে উৎপাদক, খাদক এবং বিয়োজকগুলোর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।

Monsoon
মৌসুমি বায়ু

দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জলবায়ুতে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তারকারী বায়ুপ্রবাহ। গ্রীষ্ম ও শীত মৌসুমে সমুদ্র ও ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ ও শীতলতার তারতম্যের ফলে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের দিকও পরিবর্তিত হয়। শীত মৌসুমে শুষ্ক মৌসুমি বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক (ভূভাগ) থেকে সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হয় এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ–পশ্চিম (সমুদ্রভাগ) থেকে ভূমি অভিমুখে প্রবাহিত হয়। মৌসুমি বায়ুর ইংরেজি প্রতিশব্দ মুনসুন (Monsoon) মূলত আরবি শব্দ মাওসিম (Mawsim) থেকে এসেছে। আরবিতে মাওসিম শব্দের অর্থ কাল বা ঋতু। ধারণা করা হয় এই মৌসুমি বায়ুচক্রটির সূত্রপাত ঘটে ১ কোটি ২০ লাখ বছর আগে (মধ্য মায়োসিন) হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টির সময় থেকে।

গ্রীষ্মকালে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রচণ্ড তাপের কারণে নিম্নচাপ কেন্দ্রের উৎপত্তি হয়, কিন্তু একই সময়ে তুলনামূলকভাবে শীতলতর ভারত মহাসাগরের সৃষ্টি হয় উচ্চচাপ কেন্দ্রের। বায়ুচাপের প্রকৃতিগত অভিন্নতাই উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ুকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত করে এবং মৌসুমি বায়ু সমুদ্র থেকে ভূমির দিকে

প্রবাহিত হয়। বায়ুপ্রবাহের এই ধারণাটি গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু হিসেবে পরিচিত। ভারতীয় উপমহাদেশে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প বহন করে আনে। তাই এ অঞ্চলে সে সময় ভারী বৃষ্টিপাত হয়। বিশেষ করে, বাংলাদেশ ও ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোয় এই বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে।

ভারত মহাসাগর অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু দুটি শাখায় বিভক্ত : আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগর প্রবাহ। আরব সাগর বায়ুপ্রবাহটি ভারতের কেন্দ্রভূমি এবং ভারতীয় উপদ্বীপের আবহাওয়ায় প্রকৃতির ওপর বেশি প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরের মৌসুমি বায়ুপ্রবাহটি মূলত বাংলাদেশ, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল এবং হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণাংশের পাহাড়ি ঢল ও পাদদেশীয় অঞ্চলের আবহাওয়ার প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। জুন মাসের প্রথম দিকে এই বায়ুপ্রবাহ বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং ভারতের কেন্দ্র-অঞ্চল জুড়ে অবস্থানরত নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে।

শীত মৌসুমে ভারত মহাসাগরের পানির তুলনায় এর সংলগ্ন ভারতীয় ভূখণ্ডে দ্রুত শীতল হয়ে আসে। পরিণতিতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ জুড়ে একটি উচ্চচাপ কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর ভারত মহাসাগর অভিমুখে প্রবাহিত হয়, যা শীতকালীন মৌসুমি বায়ু নামে পরিচিত। এই বায়ুপ্রবাহের একটি ধারা মোটামুটি গঙ্গার প্রবাহপথ ধরে গাঙ্গেয় সমভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় বাংলাদেশ অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে ধাবিত হয়। এই মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য হলো ভূমি থেকে সমুদ্র অভিমুখে, স্বভাবতই পুরো মৌসুমে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে। এ সময় বৃষ্টিপাতের ঘটনা খুব কম।

Micro-Climate
ক্ষুদ্রাঞ্চলীয় জলবায়ু

ভূপৃষ্ঠের বৃহৎ এলাকাব্যাপী অভিন্ন জলবায়ু দেখা যায়। কিন্তু স্থানীয় ভূপ্রকৃতি বা অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যের কারণে জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য স্থানীয়ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এবং বিশেষ জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে। এরূপ স্থানীয় জলবায়ুকে ক্ষুদ্রাঞ্চলীয় জলবায়ু বলে। যেমন—পার্বত্য জলবায়ু, সমুদ্র উপকূলবর্তী জলবায়ু, শহুরে জলবায়ু।

Ozone Layer
ওজোন স্তর

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তর। ৮/১০ মাইল গভীরতাসম্পন্ন এই স্তরে ওজোন গ্যাস রয়েছে। ওজোন গ্যাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এটি জীবজগতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে নেয়। ফলে পৃথিবীর প্রাণিকুল রক্ষা পাচ্ছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, মানুষ কর্তৃক নিঃসারিত সিএফসি গ্যাসের কারণে ওজোন স্তরের ক্ষতি সাধন হচ্ছে। একে ওজোন হোল বলে।

Sustainable Development
টেকসই উন্নয়ন

টেকসই উন্নয়ন হলো এমন একটি উন্নয়ন পদ্ধতি, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণের সুযোগ ব্যাহত না করে বর্তমান জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে সক্ষম। এর মূল বৈশিষ্ট্য দুটি। প্রথমত, মানুষের চাহিদা-সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য, যেখানে বিশ্বের দরিদ্র মানুষের চাহিদার ওপরই মূল গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন পূরণের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশের ওপর প্রযুক্তি ও সামাজিক সংগঠন আরোপিত প্রতিবন্ধকতা-সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য। টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া প্রচলন ও অব্যাহত রাখার জন্য পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে একটি পদ্ধতি নিশ্চিত করা আবশ্যক। অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোগত এমন একটা বিবর্তনধারা, যা ভবিষ্যৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগের সম্ভাবনা নস্যাৎ না করে বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগের সর্বাধিক সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে। টেকসই উন্নয়নের একটি মূল লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি সুবন্টিত অর্থনৈতিক অগ্রগতিধারা, যা প্রজন্মাপরম্পরায় অব্যাহত থাকবে।

Vulnerability
বিপদাপন্নতা

বিপদাপন্নতা বলতে বুঝি বস্তুগত, আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থা, যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কার ইঙ্গিত দেয় এবং যা কোনো ঘটনাকে মোকাবিলা করার জন্য এর সক্ষমতাকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করে। অর্থ্যাৎ বিপদাপন্নতা হচ্ছে জনগোষ্ঠীর জন্য কতগুলো আশঙ্কাজনক উপাদান বা পরিস্থিতি যা হতে পারে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কিংবা ভৌগোলিক। আবার একই সঙ্গে এগুলোকে প্রতিরোধ করা বা মোকাবিলা করায় জনগোষ্ঠী অসমর্থ হয়ে থাকে। সুতরাং বিপদাপন্নতার দুটি দিক রয়েছে। একদিকে তা বিরাজমান আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি, অন্যদিকে বিদ্যমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, অদক্ষতা ও সীমাবদ্ধতা।

দুর্যোগ ও জলবায়ু–সম্পর্কিত ওয়েব ঠিকানা

নিচের ওয়েবসাইটগুলোতে দুর্যোগ ও জলবায়ু–সম্পর্কিত বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক তথ্য-উপাত্ত, ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন নীতি ইত্যাদি পাবেন। উপাত্ত, গবেষণা ফলাফল ও নীতি ছাড়া অন্য যেকোনো তথ্য নিজে যাচাই করবেন এবং নিশ্চিত হয়ে নেবেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা–সম্পর্কিত

Prevention Web	www.preventionweb.net
Global network for civil society origination for Disaster risk reduction	www.globalnetwork-dr.org
Gender and Disaster Network	www.gdnonline.org
Global facility for disaster reduction and recovery	www.gfdrr.org/gfdrr
Disaster Management Bureau,(DMB)	www.dmb.gov.bd
Ministry of food and disaster management	www.mofdm.gov.bd
The Comprehensive Disaster Management Programme	www.cdmp.org.bd
Department of relief and rehabilitation	www.drr.gov.bd
South Asian Disaster Knowledge Network	www.saarc-sadkn.org
Bangladesh Disaster knowledge Network	www.saarc-sadkn.org/countries/bangladesh/default.aspx
SARRC Meteorological Research Center (SMRC)	www.saarc-smrc.org

Climate Change Cell	www.climatechangecell.org.bd/
Standing orders on disaster	www.dmb.gov.bd/reports/SOD-rev-30210

বন্যা ও পানিসম্পদ

Flood Forecasting and Warning Center	www.ffwc.gov.bd
Ministry of Water Resources	www.mowr.gov.bd
Water Resources Planning Organization	www.warpo.gov.bd
Bangladesh Water Development Board	www.bwdb.gov.bd
Institute of Water Modeling	www.iwmbd.org
Center for Environmental and Geographic Information Services	www.cegisbd.com
River Research Institute	www.rri.gov.bd
Southwest Area Integrated Water Resources Planning and Management	www.southwest-bwdb.info
Char Development and Settlement Programme	www.cdsp.org.bd
Bangladesh Arsenic Mitigation Water Supply Project	www.bamwsp.org
CARE: Water and Sanitation	www.care.org/careswork/whatwedo/health/water.asp

আবহাওয়া ও জলবায়ু বিষয়ক

Bangladesh Meteorological Department	www.bmd.gov.bd
World Meteorological Organization	www.wmo.int

ভূমিকম্প-বিষয়ক

SAFE	http://www.safe.org.bd/home.php? view=workingarea.php&page=1

Bangladesh Earthquake society	www.undp.org/eu/successstories/ working_for_safer_cities_in_bangladesh.shtml
Forum for Physical Development of Bangladesh	http://fpd-bd.com/?page_id=353

সাইক্লোন, টর্নেডো–সম্পর্কিত

Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organization (SPARRSO)	www.sparrso.gov.bd
Bangladesh Red Crescent Society	www.bdrcs.org
Weather underground	http://www.wunderground.com/tropical/

দুর্যোগ ও জলবায়ু বিষয়ে কাজ করছে সংস্থাসমূহ

International Union for Conservation of Nature	www.iucn.org
Inter government panel on climate change	www.ipcc.ch
The Delegation of the European Union	www.delbgd.ec.europa.eu/en/projects/forestry.htm
Concern Worldwide	http://www.concern.net/category/country/bangladesh
Oxfam	www.oxfam.org.uk/oxfam_in_action/ where_we_work/bangladesh.html
Bangladesh Disaster preparedness Center	www.bdpc.org.bd
Bangladesh Unnayan Parishad	www.bdix.net
Bangladesh center for advanced studied	www.bcas.net
United Nations Environment Programme	www.unep.org/climatechange
UN International strategy for disaster reduction UNISDR	www.unisdr.org

তথ্য সূত্রসমূহ

এই বইটিতে যেসব উৎস থেকে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে তার নাম ও প্রকাশনাকাল দেওয়া হলো:

১. National plan for disaster management 2010-2015 (www.dmb.gov.bd/reports/Nataional_Plan_for_Disaster_(2010-2015)Final_Version.pdf)

২. Disaster Preparedness for natural hazards and current status in Bangladesh, 2007 by International Centre for Integrated Mountain Development, Nepal and European Commission Humanitarian Aid (ECHO)

৩. Media Kit-Community-based disaster risk management and the media, 2006 Asian Disaster Preparedness Center, UNESCAP and European Commission Humanitarian Aid (ECHO)

৪. Media focus on Climate Change and Disaster Risk

৫. Management in 2008: an Analytical Update, Disaster Response Facility, Disaster Management Cluster, UNDP Bangladesh

৬. Know Disaster, Tell Disaster Risk Reduction, Training Handbook for Media Professionals, UN international strategy for disaster reduction, Seeds Asia, EU

৭. দুর্যোগকোষ: সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি); ২০০৯

৮. Banglapedia : National Encyclopedia of Bangladesh

৯. Wikipedia

১০. Websites of Various government agencies related to disaster management

১১. পঞ্চম অধ্যায়ের কার্টুন– সৌজন্য দ্য ডেইলি স্টার

যেকোনো দুর্যোগের আগে সংবাদমাধ্যম
দুর্যোগ-ঝুঁকি নিরসন ও প্রস্তুতির ওপর জোর দিতে পারে।
সংবাদমাধ্যম তার রিপোর্ট কিংবা ফিচার দিয়ে
নীতিনির্ধারক ও ঝুঁকির মুখোমুখি জনপদকে দুর্যোগের ঝুঁকি
সম্পর্কে অবহিত করে তাদের প্রস্তুতি বাড়াতে
উৎসাহিত করতে পারে।